চাণক্য সেন

আজ এখানে



আজ এখানে

আজ এখানে

চাণক্য সেন

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৭৯

প্রকাশক
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
খালেদ চৌধুরী

সাত টাকা

নিউ ইয়র্কের
বিজন ও অনীতা বসাক-কে

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের আর একটি উপন্যাস

অশোক উদ্ভিদ মাত্র

এ গ্রন্থের গল্পগুলি দিল্লীর 'ইন্দ্রপ্রস্থ', কলকাতার 'সিনেমা জগৎ', 'চতুরঙ্গ', এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। একত্র ক'রে পাঠকদের হাতে তুলে দেবার সময় পত্রিকাগুলির সম্পাদকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য, আমার কাছে, 'সেই বার্ধক্য চাই' নাটকের অনুযুক্তি। পাঠকরা নাটক-পাঠের অভ্যাস না তৈরী করলে, বাংলাভাষায় সত্যিকারের নাট্যসাহিত্য সৃষ্ট হবে না। পাঠকদের প্রতি আমি, অতএব, এ নাটকটা নিক্ষেপই করলাম: পড়ে দেখুন, যদি গালমন্দও করেন, তাহলেও সাহিত্যিক প্রচেষ্টা সার্থক। সাহিত্যিক প্রশংশিত হ'তে চান, নিন্দিত হ'তেও আপত্তি থাকার কথা নয়, যা চান না তা হল উপেক্ষা। বাংলা নাটক বাঙ্গালী পাঠকদের উপেক্ষা কাটিয়ে না উঠলে সাহিত্যের মর্য্যাদার অধিকারী হবে না।

চাণক্য সেন

নিউ দিল্লী
মহালয়া, ১৯৭২

সকাল থেকে মাঝরাত্রি পর্যন্ত নিজের চেহারা নিজের চোখে দেখবার অবসর হয় না। প্রয়োজনও না, আগ্রহও না। যে ঘটনাগুলো ক্রমে ক্রমে ঘটে আসছিল, যাদের সঙ্গে ওর নিজের কোনও কারক-সম্পর্ক ছিল না, যে-জন্যে ভারতবর্ষে জন্মালে অদৃষ্টবাদ না মেনে উপায় নেই, সেগুলো, আরও অনেক ঘটনার সঙ্গে মিশে, একসময় এমন একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করল, যখন ওর কাছে আমি নামক শব্দটা কেমন ছোট্ট, নগণ্য, উহ্য অবান্তর হয়ে গেল, তবে খুব যে একটা ব্যথা পেল তাও নয়, আসলে ব্যথা বোধটাও বোবা হয়ে গেল, এবং সবসুদ্ধ এমন একটা অদার্শনিক অব্যয় হয়ে দাঁড়াল জীবনটা, এমন আলতোভাবে, হালকাভাবে অস্বকীয়, যে নিজের দেহের পানে তাকিয়ে দেখবার ঐতিহাসিক বিলাসিতা টিকটিকির লেজের মতো বিনা ক্ষতিতে এক সময় টুপ করে খসে গেল।

যেমন আজ। ঘুম ভাঙতে অক্ষমনীয় দেরি হয়ে গেল ; পাঁচটা পঁয়ত্রিশ। ধড়মড় করে উঠতে গিয়ে শাড়ি সামলাবার সময় পেল না। কোনও মতে পেটিকোট প'রে, দড়ি বেঁধে, ব্লাউজ খুলে, ব্রা গলিয়ে, ব্লাউজ পরে, শাড়িটা গায়ে আধা-জড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকে স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চাপাল। স্মরজিৎ ইতিমধ্যে দুধ আনতে বেরিয়ে গেছে, এক্ষুনি এসে পড়বে, ছ'টার আগেই তাকে রাস্তায় নেমে বাস-স্টপের জন্যে বড় বড় পা ফেলতে হবে। পেটিকোট পরবার সময় আবছা একবার মনে হল, ঠিক মনে হওয়া বলে না একে, মনে হয়েও হল না,

পেটে আরও মাংস জমেছে, ভুঁড়ি কেবল বেড়ে চলেছে, দড়ি বাঁধবার সময়, তাই বলে, কসে বাঁধল না একটুও, বরং এমনভাবে শাড়িটা কোমরে ও দেহে আধ-জড়াল, যেন দারুণ মোটাসোটা মেয়েমানুষ। চা তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে স্টোভেই গোটা চারেক পাঁউরুটির টোস্ট তৈরি করে নিল, জ্যামের শিশিটা হাতে নিয়ে দেখল শূন্য, মাখন কেনা অনেকদিন বন্ধ, মনে মনে বলল, এই সেরেছে, আজ শুধু পাঁউরুটি খেতে হবে দেখছি। প্রায় এমন সময় স্মরজিৎ ফিরে এল, দুধের পাত্র ওর কাছাকাছি মাটিতে রেখে স্নানের ঘরে চলে গেল, মিনিট পাঁচেক পরে স্নান করার শব্দ এল ওর কানে, তখন দুধ উথলে উঠেছে, আর পাশের ঘর থেকে চৈতালি, ওদের একমাত্র মেয়ে, ডাকছে, মা, একটু আসতে পার? দুধ নামিয়ে চৈতালির ঘরে গিয়ে দেখল, সে উঠে পড়েছে, বিছানা থেকে নেমে টেবিলটার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কি একটা খুঁজছে, মার উপস্থিতি টের পেয়ে বলল, কাল শোবার সময় ফিতেটা কোথায় যে রাখলাম··ফিতেটা টেবিলের ওপর চৈতালির চোখের সামনেই ছিল, চোখ নেই তাই দেখতে পাবার কথা ওঠে না, থাকলে নিজেই খুঁজে নিত, ফিতে-কাঁটা-চিরুনী চৈতালির হাতে তুলে দিয়ে ও বলল, তোকে ক'টার মধ্যে বেরুতে হবে? শুনল, সাতটা। রান্নাঘরে ফিরতে ফিরতে বলল, তবে চটপট স্নান-টান সেরে নে, আমি জলখাবার ঠিক করছি।

ছ'টা বাজবার একটু আগেই স্মরজিৎ বেরিয়ে গেল, খালি খালি পাঁউরুটি খেতে পরিষ্কার খারাপ লাগছিল, স্টোভে কি আর টোস্ট হয়? বরং বলতে পারো সেঁকা পাঁউরুটি, ও বলেছিল, দুধে ভিজিয়ে চিনি লাগিয়ে নাও, খেতে মন্দ লাগে না, স্মরজিৎ তা করে নি, শুধু একটু হেসেছিল, তার অনেক দিনে একটু একটু করে আয়ত্তে আনা হাসি, সনাতন ধর্মের মতো সহনশীল, সব কিছু কাফ্‌কা-নৈরাশ্যে গ্রহণ করার হাসি, বিদ্রূপ নেই, ঝাঁঝ নেই, প্রতিবাদ নেই, আগ্রহ নেই, হ'তে দাও,

চলতে-দাও চলুক-না হাসি। সকালবেলা ওদের মধ্যে কথাবার্তা প্রায় হয় না, হবার সময় নেই, দরকারী দু-চারটে ওটা-কোথায় একটা-কথা-আছে শব্দ, একে অন্যের প্রতি পাথর-নুড়ি ছোঁড়া : স্মরজিতের প্রথম প্রাতঃকালীন লক্ষ্য বৌবাজারের সাতশ' অলি-গলির মধ্যে একটিতে সাতটার মধ্যে ঢুকে প'ড়ে তিনতলা বাড়ির দোতলার চার নম্বর ফ্ল্যাটে দু'ঘন্টা ছাত্র পড়ানো ; আর ওর প্রথম কর্তব্য স্মরজিৎকে চা-রুটি খাইয়ে দেওয়া, না খেলে হয়তো বা সারাটা দিনই খাওয়া হবে না, নয়তো রেস্তোরাঁয় ঢুকে যে পয়সাটা স্মরজিৎ খাবার জন্যে খরচ করবে তার চাবুক খেতে হবে দুজনকেই দু-চারদিনের মধ্যে। স্মরজিৎ চলে গেলে চৈতালির জন্যে ও একটা ডিম সেদ্ধ বসাল, মেয়ের দুধে অরুচি, সকালে তো খাবেই না, রাত্রিতে কখনও ধমকে কখনও মা-লক্ষ্মী-খেয়ে-নাও ক'রে কোনও মতে খাইয়ে দিতে হয় ; আজ একটা জ্যাম আনতেই হবে ঘরের জন্যে, দাম যা বাড়ছে সব কিছুর, শুনতে পেল চৈতালি বলছে, মা, ব্রা'র হুকটা ছিঁড়ে গেছে, সূঁচসুতো নিয়ে একবারটি এসো না, চৈতালি স্নান সেরে খালি গায়ে, শাড়ি জড়ানো অবশ্য, কি কচি আর তাজা আর সুন্দর ওর শরীর, ওদিকে সাড়ে ছ'টা বেজে গেল, নে, এবার চটপট তৈরি হয়ে নে, শাড়ি পরে খেতে চলে আয়। চৈতালিকে না খাইয়ে ওঠা যায় না, খাওয়া শেষ হ'তে হ'তে ও দৌড়ে স্নানের ঘরে গেল, টান মেরে মেরে ন্যাংটো হল, ঝুপ ঝুপ জল ঢালল ন্যাংটো দেহে, মাগো কি আরাম, সপসপে তোয়ালে দিয়ে গা মুছল, চট্‌পট পরে নিল পেটিকোট, ব্রা, ব্লাউজ, শাড়ি, বেরিয়ে এসে আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়ে নিল, সিঁদুর পরল না, সিঁথিতে দাগ রয়েছে, এই যথেষ্ট ; একবারও নিজেকে দেখবার প্রয়োজন হল না, সময়ও। চৈতালি তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল, তাকে সঙ্গে নিয়ে সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ল ও, অন্ধ মেয়ে রোজ পিয়ানো শিখতে যায় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে, পৌঁছে দিতে হয়, এবং নিয়ে আসতে হয়।

অবশ্য চৈতালিকে মিসেস বসাকের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ওকেও একটা কাজ সেরে নিতে হয় ; ও পাড়ার এক ডজন অবস্থাপন্ন বাড়িতে ভালো-খেয়ে-পরে ভালো-থাকে দেড় ডজন মেয়ে নতুন বাটিক শিখে শখের বশে নানা রকম চারু-শিল্প করে ; শাড়ি অথবা কুশন কভার, অথবা টি-কোজি অথবা অজন্তা-ইলোরার মূর্তি ; এদের সঙ্গে দেখা করে যার কাছে যা পাওয়া যায় নিয়ে আসে ও, ততোক্ষণে অর্থাৎ এক ঘণ্টা পনের মিনিটে, চৈতালির পাঠ শেষ ; এবার মেয়েকে নিয়ে বেশ কিছুটা হেঁটে গিয়ে ট্রাম ধরতে হয়, এবং পৌঁছতে হয় কলেজ স্কোয়ারে বিশ্ববিত্থালয়ে, ক্লাস শুরু হবার বেশ আগেই, নইলে উপায় নেই ; চৈতালিকেও ক্লাস শেষ হবার পরেও অপেক্ষা করতে হয় স্মরজিতের জন্যে, দিনের চক্কর শেষ ক'রে স্মরজিৎ আসে কলেজ স্কোয়ারে, চৈতালিকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছতে কোনও দিন বা প্রায়-সন্ধ্যা, কখনও সন্ধ্যা উত্তীর্ণ।

মেয়েকে বিশ্ববিত্থালয়ে রেখে উল্টো ট্রাম ধরে এলগিন রোডে ফিরে আসতে আসতে দশটা বাজে। এসে স্বস্তির সঙ্গে দেখে রেণুর মা দোকানঘর খুলেছে। ঝাড়পোঁছ করে ফেলেছে, ছু একটি খদ্দের এসেও গেছে, তাদের বলছে, একটু দাঁড়াও বাছা, বৌদি এলেন বলে, এই ছু'মিনিট দাঁড়াও। ওপরে না গিয়ে ও সোজা দোকানেই ঢুকে পড়ে। চাবি বার করে আলমারিগুলো খুলতে খুলতে খদ্দেরদের সঙ্গে কথা বলা, বেচা, হিসেব করা, টাকা-পয়সা দেওয়া-নেওয়া শুরু হয়ে যায়। কেউ বলে, এত দেরি ক'রে দোকান খুললে খদ্দের পাবেন কি ক'রে? দশটার পরে কে আর দোকান করতে আসে? মৃছ মিষ্টি হেসে ও জবাব দেয়, এর আগে আর পেরে উঠি নে। মনে মনে বলে, আমি আর কি জানি না যে সাতটায় দোকান খুলে বসতে পারলে দিনে অন্তত তিন চার টাকা বেশি ঘরে আসতো? ডিম, পাঁউরুটি, মাখন, জ্যাম জেলী বিক্রি হ'ত বেশ। উপায় কি? দশটার আগে একদিনও দোকান খোলা সম্ভব হল না, হবার উপায় নেই।

দোকানটাই এখন ওর সারাদিনের, দিনের পর দিন গড়িয়ে সারা মাসের, মাসে-মাসে সারা বছরের, প্রধান কর্মকেন্দ্র। দোকানের সঙ্গে জড়িত রয়েছে সংসার, যার বিস্তৃতি তো কেবল অর্ধবেকার এবং দরিদ্র, যদিও প্রতিভাবান, স্বামী, এবং আশ্চর্য সম্ভাবনায় ব্যথিত অন্ধকারে বেড়ে-ওঠা একুশ বছরের মেয়ে চৈতালি নয়, সংসার মানে সদানন্দ রোডের শতাব্দী-পুরানো বাড়িটার দোতলায় দু-খানা-ঘর ও একপোয়া ছাদ, পনেরটা টবে সযত্নে সংপালিত বাগান, টিয়াপাখি, মিনু-বেড়াল, এবং উনিশশ' একাত্তর সালের কলকাতা, যার অন্য নাম দৈনন্দিন আতঙ্ক। সংসারের সঙ্গে দোকানের সংমিলন অনেকটা পশ্চিমবঙ্গের কোয়ালিশন সরকারের মতো : প্রধান, এবং সর্বদা প্রথম সমস্যা, টিকে থাকা। অথচ, পুনরায় কোয়ালিশন উপমা প্রযোজ্য, এই ভঙ্গুর সংমিলনের মধ্যে নাটকীয় সম্ভাবনা এতো বেশি, সার্থক হ'লে এমন ধ্রুপদী হবে এর বিপ্লবী অবদান, সার্থক হবার প্রতিজ্ঞা যতোই হোক না ক্ষীণ, যে দোকানটাকে নিয়ে দিনরাত লড়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। মনে করুন, আততায়ীর ছুরিকা আপনার চোখের সামনে উদ্যত, অথচ ছুরিকার ভয়াল সৌন্দর্যে আপনি এমন সম্মোহিত যে চোখ ফেরাবার উপায় আপনার নেই, ছুরিকার আঘাত যে মুহূর্তে আপনার ওপর পড়বে, সে আসন্ন দুর্ঘটনাও গৌণ।

স্মরজিৎ প্রথম থেকে আপত্তি ক'রে আসছিল। প্রতিভাবান বুদ্ধিজীবী হিসেবে একদা স্মরজিতের সুনাম ছিল ; এখনও প্রতিভা কম নেই ; যার সুদীর্ঘকাল অভাবে প্রতিভা বর্তমানে বেকার, তা হল কর্মজীবনে অর্থকরী সার্থকতা। এককালে, অনেক বছর আগে, যখন, চেষ্টা করলে মনে পড়বে আপনাদের, কলকাতার জীবন রজনীগন্ধা ছিল, স্মরজিৎ ভালো টাকার মাইনেতে চাকরি করত, তার সুশ্রী যুবকদেহ উপস্থিতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত, তার ধ্রুপদী শৈলীতে লেখা প্রবন্ধগুলি নিয়ে কফি-হাউসে সরগরম আলোচনা হত। প্রতিভার

জোরে একসময় বিদেশেও গিয়েছিল, একা নয়, স্ত্রী কন্যা সহ, তাতে বিদগ্ধ সমাজে তার মান বেড়েছিল নিশ্চয়। কতকগুলি ঘটনা, দুর্ঘটনার জটিল চক্রান্তে স্মরজিৎ এখন স্থায়ীভাবে ব্যর্থ, তথাপি আহত অহমিকায় কয়েকটা স্পর্শকাতর বিষয়ে এখনও বিদ্যুতের মতো সজীব। একটা হল : সৃজনশীল চিন্তায় তার স্বকীয় অগ্রাধিকার। দোকানের কথা আদৌ তার মনে হয় নি, আইডিয়াটা অঙ্কুরিত হয়েছে স্ত্রীর মাথায়, উচ্চারিত হয়েছে স্ত্রীর মুখে ; স্মরজিৎ, অতএব, প্রথম থেকেই জোর আপত্তি ক'রে আসছিল।

'অসম্ভব। এ হয় না।' স্মরজিতের কণ্ঠস্বরে হঠাৎ কোথা থেকে জোর এসে যায়, নিজেই সে বিস্মিত হয়।

'কেন হবে না ? নিচের একটা ঘর খালি করিয়ে নেব। ওটা না হলেও আমাদের চলবে।'

'একেবারে অবাস্তব আইডিয়া। নিছক রোমান্টিসিজিম।'

'তা তুমি যাই বলো। দোকান ছাড়া কোন উপায় নেই।'

'শোনো। বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের বৌ-রা দোকান চালায় না। লোকে ভিড় ক'রে তাকিয়ে থাকবে, বিক্রি হবে না এক পয়সা। প্রতিবেশী, আত্মীয় ধারে জিনিস নেবে, কদাচ শোধ করবে না। দোকান মানে বিক্রি নয়, কেনাও, অর্থাৎ তোমাকে ঘুরে ঘুরে মালপত্র কিনতে হবে, বেচতে হবে, মাল মিলিয়ে নিতে হবে, হিসেব লিখতে হবে, বাকী আদায় করতে হবে, একা, কারুর সাহায্য না নিয়ে, তোমার কেন, স্বয়ং লক্ষ্মী ঠাকরুণের পক্ষেও অসম্ভব। সবার ওপরে, দোকান পেতে বসতে কমসে-কম পাঁচ-সাত হাজার টাকা লাগবে যা আমাদের নেই।'

'আমি এসব ভেবেছি', ওর গলা আশ্চর্য রকম শান্ত, 'ভেবেচিন্তেই ঠিক করেছি, দোকান পাততেই হবে। টাকার সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেছে। আমার গহনাগুলো ব্যাঙ্কে রয়েছে, ওগুলো বন্ধক করলে চার হাজার পাওয়া যাবে। আর দু-হাজার দাদা দেবে, আমার দাদা।

রোজ যদি একশ' টাকা বিক্রি হয়, পনের টাকা বাঁচবে। বেশীও হতে পারে। ভাড়া দেব পঞ্চাশ টাকা। দোকান থেকে আমি দুশো টাকা তুলে আনতে পারব প্রতি মাসে। চৈতালিকে পিয়ানো শেখাতে হলে, আর ওর এম. এ. পড়া চালিয়ে নিতে গেলে, এ টাকাটা চাইই। অন্য কোনও উপায় নেই দুশো টাকা বাড়তি রোজগারের। দোকান পাততেই হবে।'

'ফেল পড়বে। তখন একেবারে সর্বনাশ।' স্মরজিৎ সর্বনাশের দুশমনী চেহারা দেখে আঁতকে ওঠে।

'জীবনে অনেক কিছু ফেল পড়েছে', ওর উত্তর তখনও শান্ত, 'না হয় আর একবার পড়বে।'

ক'রে ছাড়ল শেষ পর্যন্ত। এক তলার ডান কোণের ঘরটা খালি করল। রাস্তার সঙ্গে দরজা ছিল, দোকানের উপযোগী ক'রে নিতে অসুবিধা হল না। পুরানো ফার্নিচারের দোকানে ঘুরে ঘুরে দুটো আলমারি এবং একটা শো-কেস কিনে আনল। পাইকারী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে লেনদেনের ব্যবস্থা ক'রে আলমারি দুটোকে ভ'রে ফেলল মালপত্রে : আমূল বেবী ফুড থেকে নিত্য ব্যবহারের প্রায় সব কিছু দিয়ে। যোগাড় করল ছাপানো শাড়ি, ঘরে তৈরি ব্লাউজ, পেটিকোট, রুমাল, শপিং ব্যাগ, এবং বাটিকের কাজ করা ঘর-সাজানো শৌখিন সব জিনিস। স্বামীর বন্ধু, বাটা-কোম্পানির রিটেল সেল্‌স ম্যানেজারকে ডেকে আনল দোকান সাজাবার পরামর্শের জন্যে। তিন হাজার টাকার মাল এমন সুরুচিশোভায় ফুটে উঠল দোকান যে খদ্দরের অভাব হল না। স্বামীর আর এক বন্ধু ক্লারিঅন কোম্পানির চীফ কমার্শিয়াল আর্টিস্ট, সাইনবোর্ড এঁকে দিল। জন্ম নিল : একশ' তিন নম্বর সদানন্দ রোড, কলকাতায় প্রথম এবং একমাত্র মহিলা-প্রতিষ্ঠিত মহিলা-চালিত স্টেশনারী দোকান : 'আজ, এখানে'।

দোকান নিয়ে এমন একটা উৎসাহ-উত্তেজনার সৃষ্টি হল যে

স্মরজিৎকেও অবিলম্বে তার অংশী হ'তে হল। বন্ধুরা, যাদের সঙ্গে এককালে সমান্তরাল সমাজের সম্পর্ক ছিল, যারা আজকাল স্মরজিতের বিত্তহীন প্রতিভাকে করুণা ও সহানুভূতির সঙ্গে দেখে, হঠাৎ দোকান-স্থাপয়িকার সৃষ্টিশীল পরিশ্রমের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। অনেকে দূর তুচ্ছ ক'রে সওদা কিনতে এল সদানন্দ রোড়ে। বাহবার সঙ্গে যোগ করল ব্যবহারিক সমর্থন। কলকাতার বত্রিশটি ফ্লাটের বৈঠকখানায় 'আজ, এখানে' হয়ে উঠল উত্তেজিত আলোচ্য বিষয়। ক্রিয়েটিভ উদ্যোগ বাঙালীর নেই, কে বলবে? দেখে এসো একশ' তিন নম্বর সদানন্দ রোডে। পঞ্চাশ বছর বয়সে এক দরিদ্র অভিজাত মহিলা দেখিয়ে দিলেন বটে। স্মরজিতের মনে হল তার সফল দিনগুলোতেও কোনও সদ্যপ্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলন এই উত্তেজনার একাংশ আদায় করতে পারে নি। দোকানে বসে সে বিক্রি করতে রাজী হয় নি, মালিকের কাছ থেকে অনুরোধও আসে নি। কিন্তু বেশি রাত্রে হিসেব মিলানোয় সাহায্য করতে নিজেই এগিয়ে এসেছে।

যাকে নিয়ে এতো হৈ-চৈ, সে কিন্তু উত্তেজক আত্মতৃপ্তির কাছা-কাছিও গেল না। তার কাছে দোকান মানে সকাল দশটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত একটানা খাটুনি; এবং মাসে বাড়তি আয়ে চৈতালির পিয়ানো শেখা আর এম. এ. ক্লাসের বই কেনার ব্যবস্থা। এর বেশী উপরি পাওনার ব্যথা মুখে না বললেও মনে মনে সে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। দারিদ্র্য ও অভাব জীবনের পরিধিকে বড় বেশী সঙ্কুচিত ক'রে এনেছিল: অভাব, আপসোস, নালিশ আর, অভ্যাসবশত, দেহ; দোকানটা এনে দিল মুক্তির আস্বাদ: নতুন উদ্যম, অনেক শ্রম, জল্পনা-কল্পনা, অনেক দুশ্চিন্তা, নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয়, বহু কথা-কাটাকাটি, দৌড়-ঝাঁপ, ভয়, সন্দেহ, নিশ্ছিদ্র পরিপূর্ণ ক্লান্তি। সব মিলে জীবনটা আবার বেঁচে উঠল, অনুভূতিগুলি আবার হল সজাগ। পুরুষ খদ্দেররা সওদা করতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে দেহের

কোন এক ভুলে-যাওয়া কোথাও কেমন একটা মৃদু শিহরণ লাগে, মনে হয়, বেঁচে আছি। পাড়ার, বেপাড়ার রক-বাজ ছেলেগুলো দোকানে ঢুকলে ঠাণ্ডা একটি অনুভূতি শিরদাঁড়া বেয়ে মাথায় উঠে আসে, সন্দেহ-ভয়-সাহসের সংমিশ্রিত মুহূর্তগুলি বুকের স্পন্দনকে কাঁপুনিতে পৌঁছবার আয়োজন করছে দেখতে পেয়ে সে মনে মনে বলে, থিঁতলে বেঁচে থাকার চেয়ে বরং এও ভালো।

চারটে বখাটে ছেলে একদিন দোকানে ঢুকে পনের মিনিট এমন ভাব দেখাল যেন তারা নিজেদের দোকানে ইনস্পেকশনে এসেছে : মেরুদণ্ডটা ওর প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, তবু মুখে হাসির প্রলেপ বজায় রেখে, তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অন্য খদ্দেরদের সামলাল, বুঝতে পারল ইন্দ্রিয়গুলি আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে সম্ভাব্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেছে, যা জীবনে আগে কখনও হয় নি, এবং সব কিছু নিয়ে নিজেকে তার মন্দ লাগল না। ছেলেগুলো সিগারেট কিনল, চুইংগাম কিনল, একজন কিনল একখানা রুমাল, দাম দেবার ইচ্ছে ছিল না, নিজেদের মধ্যে কি-সব কথাবার্তা বলে শেষ পর্যন্ত দামও দিল, তার আগে অবশ্য ও বলেছিল, 'আমি কাউকে ধারে বিক্রি করি নে, সামান্য পুঁজি ধারে দিতে শুরু করলে দোকান দুদিনে উঠে যাবে,' এবং চলে যাবার আগে দলের মোড়ল প্রশ্ন করল, 'আপনার কি মনে হয় ভদ্র পাড়ার মেয়েছেলেদের দোকান পেতে বসা উচিত?' উত্তরে ও বলল, 'কেন নয়? রাশিয়া চীনে তো দোকান সাধারণত মেয়েরাই চালায়,' সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেলে বলে উঠল, 'কে বলল আপনাকে?' ও একটু হেসে জবাব দিল, 'কেউ না, আমার নিজের চোখে দেখা, রাশিয়ায় আমি চার বছর ছিলাম, চীনে দুমাস,' ছেলেটা জানতে চাইল, 'কখন?' সে বলল, 'খুব বেশি দিন আগে নয়, তবে তুমি বোধহয় তখন স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়তে,' যাবার সময় মোড়ল বলল,

'আমাদের ভেবে দেখতে হবে আপনার পক্ষে দোকান চালানো ঠিক হবে কিনা' ওরা চলে গেলে টের পেল পা কাঁপছে, কপালে ঘামের বিন্দুগুলো ভারী। সঙ্গে সঙ্গে দেহের স্নায়ুতন্ত্রীতে দুঃসাহসিক তৎপরতা অনুভব করল আত্মরক্ষা, দোকান রক্ষার জন্যে। স্মরজিৎকে বিপদের সংবাদ দেওয়া মানে তার প্রথম থেকে নিষেধের জয় ঘোষণা করা, নিজের পরাজয় স্বীকার ক'রে নেওয়া। পুলিসের সাহায্য নিয়ে দোকান চালানো কলকাতার রঙ্গমঞ্চে প্রহসন হ'তে পারবে, কিন্তু দর্শকদের কৌতুক বোধের অভাবে, নাটক চলবে না। স্মরজিতের উঁচু-নাক বন্ধুদের কাছে পরামর্শ চাওয়ার মানে দোকান যে-কোনদিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে এ মর্মে বাজারে নোটিস দেওয়া। একটা জীবন-মরণ সমস্যা নিয়ে নিজে যে সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারছে এ আবিষ্কার তার দোকান বাঁচিয়ে রাখার সংকল্প দৃঢ়তর করল, এবং, শেষ পর্যন্ত, সে পরামর্শ চাইল চৈতালির কাছে।

'তুমি তো ওদের চেন, মা,' ঘটনাটা শুনে চৈতালি বলল, 'এ পাড়ারই ছেলে ওরা। রবি, কানু, ভোলা, তাপস। তুমি তো ওদের চেন।'

'ওদের আর চেনা যায় না, জানিস! মনে হয় একেবারে অচেনা, অপরিচিত। ওরাও আমাকে আর চেনে না।'

'তুমি ভয় পেয়েছ, মা।'

'তা পেয়েছি।'

'দোকান তুমি চালিয়ে যেতে চাও, না?'

'তা নইলে তোর পড়ার খরচ আসবে কোত্থেকে?'

'আমি না হয় না-পড়লাম। পিয়ানো শিখতেই হবে এমন কথা নেই।'

'তা হয় না।'

'মা, আমার পড়া আর পিয়ানো ছাড়াও দোকান চালানো তোমার দরকার, তাই না?'

'হ্যাঁ রে, খুব দরকার,' স্বীকার করল সে।

'আজ থেকে সন্ধ্যেবেলা আমি দোকানে বসব,' ঘোষণা করল চৈতালি। 'আমাকে পরিস্থিতিটা দেখে নিতে দাও।'

'তুই পারবি একঘণ্টা দোকানে বসতে?'

'অন্ধরা অনেক কিছু দেখতে পায়, মা, যা চোখ-ওয়ালা তোমরা পাও না। আমাকে কেউ ঠকিয়ে পার পাবে না। কেউ কিছু তুলেও নিতে পারবে না। তুমি দেখে নিও।'

'আজ, এখানে'-র এর চেয়ে বড় বিজ্ঞাপন হ'তে পারত না। সন্ধ্যে সাতটা থেকে আটটা, কখনও তারও বেশি। চৈতালি দোকানের ভার নিল। কে না জানে চৈতালি ছবির মতো সুন্দর এবং অমাবস্যা রাত্রির মতো অন্ধ? কে না জানে জন্মেছিল সামান্য দৃষ্টি নিয়ে, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু ক'রে চৈতালির চোখের আলো গেছে নিভে? কে না জানে, চৈতালি পর পর পরীক্ষায় ভালোভাবে পাস ক'রে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল নিয়ে এম. এ. পড়ছে? কে না জানে চৈতালি সুন্দর পিয়ানো বাজায়, পিয়ানো শেখে কলকাতার সেরা পিয়ানো-বাজিয়ে মিসেস বসাকের কাছে, রেডিয়োতে মাসে একটা প্রোগ্রাম নিয়মিত পেয়ে থাকে? কে না জানে, চৈতালিকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই তার মা দোকান পেতেছে? সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা কেটে গেছে দোকানটাকে বাঁচিয়ে রাখতে।

চৈতালিকে দোকানে বসিয়ে রোজ সে বেরিয়ে যেতে পারল কেনা-কাটি করতে। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের হাতের কাজ জমা হ'তে লাগল দোকানে, এসব জিনিস বিক্রিতে লাভ বেশি।

একদিন সাতটা ছত্রিশে চৈতালি বসেছিল দোকানে শো-কেসটার সংলগ্ন চেয়ারে। দু চারজন খদ্দের ছিল দোকানে, তাদের সামলাতে কষ্ট হচ্ছিল না চৈতালির। 'আপনার আমূল বেবী ফুড চাই, ঐ দেখুন ওখানটায় আছে, একটা নিয়ে আসুন না দয়া ক'রে এখানে। আমি

যতক্ষণ দোকানে বসি, এখানে সেল্‌ফ সারভিস, জানেন ? আপনি কি কি চান তুলে নিন, বুঝলেন ? এই যে, দেখুন, বোর্নভিটার-কৌটোটা দয়া ক'রে ঠিক জায়গায় তুলে রাখুন। আপনার চাই মার্গো সোপ ? ঐ যে, ওখানটায় পাবেন।' এরই মধ্যে চৈতালি বুঝতে পারল কে একজন দোকানে ঢুকেছে, খদ্দের নয় সে, দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে, সবার থেকে আলাদা, তাকিয়ে আছে, তাই তো, তাকিয়ে আছে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে, চৈতালির দিকে, এখন দোকানটাকে দেখছে, লোক তো নয়, একটি ছেলে চৈতালি টের পেল, একুশ-বাইশ বয়স হবে মনে হচ্ছে, কিংবা একটু বেশি, চৈতালি অন্ধ চোখে দেখল ছেলেটি লম্বা, সরু সরু হাত-পা, মাথায় ছোট্ট ক'রে ছাঁটা চুল, কপালটা কি বেশি চওড়া নয় ? এক সময় দোকানে সে ছাড়া আর কেউ রইল না, সেই ছেলেটি আর চৈতালি, এবং চৈতালি প্রশ্ন করল, 'আপনার কি চাই ?'

ছেলেটি কাছে এগিয়ে এল।

'কিছু চাই আপনার ?'

'একটা কথা ছিল,' ধীরে বলল ছেলেটি, 'আপনার মার সঙ্গে।'

'মা আটটার পরে আসবেন। আপনি বসুন।'

'অতক্ষণ বসতে পারব না।'

'তাহলে আমাকে বলুন।'

'তাই বলি। কয়েকটা ছেলে এসেছিল আপনাদের দোকানে ক'দিন আগে ?'

'রোজই তো অনেক ছেলে আসে।'

'ওরা আলাদা। আপনার মা হলে আমার প্রশ্ন বুঝতে পারতেন।'

'আমিও পারছি। এসেছিল।'

'আপনার মাকে শাসিয়ে গেছে ?'

'ও-ধরনের কিছু একটা ঘটেছিল।'

'আপনার মাকে বলবেন, তাঁর কোনও ভয় নেই। আপনার দোকানের কোনও ক্ষতি হবে না। কেউ আসবে না হামলা করতে।' একটু থেমে, 'মানে যতোদিন আমরা আছি।'

'আপনারা কারা? ওরা কারা?'

'ওরা গুণ্ডা। আমাদের পরিচয়ে আপনার প্রয়োজন নেই। যা বলে গেলাম, মাকে বলবেন।'

'বলব। আপনি যেই হোন, আপনার আশ্বাসের মূল্য যাই হোক, আমাদের ধন্যবাদ নেবেন।'

'আচ্ছা চলি।' সিঁড়িতে পা দিয়ে ছেলেটি ফিরে এল। 'আপনি খুব সুন্দর পিয়ানো বাজান।'

'আপনি পিয়ানো ভালো বাসেন?'

'ভালো তো কত কিছুই বাসি, বাসতাম। বাজাতে জানি না। শেখবার সুযোগ কথায় বলুন?'

'তা বটে।'

'আপনি সেদিন রেডিয়োতে বীঠোফেনের 'ওড্ টু জয়' বাজাচ্ছিলেন। নাইনথ্ সীমফনি। ভালো লাগছিল শুনতে। আচ্ছা, চলি। মাকে বলবেন।'

ছেলেটিকে চৈতালি দেখতে পায় নি। আসলে ওর বয়স ছিল তেইশ, লম্বা, পেশল দেহ, মাথায় এক ঝাঁক চুল, মোটা কালো রীমের চশমা, পরনে ময়লা ট্রাউজার, আধ-ময়লা শার্ট, তিনদিনের জমানো দাড়ি।

চৈতালি বলেছিল মাকে। ছেলেটি কে, এক অনভিনীত আতঙ্ক-নাটকে কি তার ভূমিকা, তার আশ্বাসের দামই বা কি এসব নিয়ে মা ও মেয়েতে আলোচনাও হয়েছিল। মা বলেছিল, ওরা আসল নকশাল। ওদের আদর্শবাদ আছে। চৈতালির শুধু মনে ছিল, ছেলেটা বীঠোফেন ভালোবাসে, 'ওড্ টু জয়' শুনে তার ভালো লেগেছিল।

দোকানটা যে চলতে লাগল, উঠে গেল না, লুট হল না, ধারে বিক্রির চাপে ফেল পড়ল না, স্মরজিৎ এ সত্য মানতে বাধ্য হ'লেও তার মন উদার হ'তে পারল না। সকালবেলা ছাত্র পড়িয়ে তার আয় একশ' টাকা। খুচরা নানা ধরনের মস্তিষ্ক খাটনো, কাজকর্ম যোগাড় করতে দিনের বেশির ভাগ কেটে যায়, বিকালে অথবা সন্ধ্যায় চৈতালিকে কলেজ স্কোয়ার থেকে সংগ্রহ ক'রে বাড়ি পৌঁছে, রাত্রিতে এখনও স্মরজিৎ সাহিত্যচর্চা করে। রেণুর মা বিকেলে এসে রান্না ক'রে রাখে, চৈতালিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলে স্মরজিৎ রেণুর মার হাতে চা-মুড়ি-কখনও-সিঙাড়া খেতে পায়, চৈতালির জন্যে বরাদ্দ থাকে এক প্লেট ফল, চৈতালি সাতটা নাগাদ দোকানে গিয়ে বসে, তার মা চলে আসে ওপরে, স্বামীর সঙ্গে দু-চারটে কথাবার্তা হয়, সে বেরিয়ে যায় রোজকার কেনাকাটিতে, মাল-সংগ্রহে। নটা থেকে দশটার মধ্যে এক সময় দোকান বন্ধ ক'রে সে ওপরে আসে, তিনজনে বসে রাত্রির আহার, স্মরজিৎ তখন বসে দৈনন্দিন দোকানের হিসেব নিয়ে, নথিপত্র নিয়ে ও বসে পাশে। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমালাপ হয়।

'এ খাটুনি কত দিন নেবে শরীর?' স্মরজিৎ রসিদ বই দেখতে দেখতে প্রশ্ন করে।

'নিচ্ছে তো। ওটা বারো টাকা চুয়াত্তর পয়সা, আটাত্তর নয়।'

'নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ কখনও?'

'সময় কৈ? হীমা প্রডাক্টসগুলো বেশ চলছে, না? এবার কিছু স্টক করতে হবে।'

'এক একটা বাটিক শাড়িতে কত থাকে?'

'এটায় ছ'টাকা। বেশ ভালো লাভ, কি বলো? আর কয়েকটা যোগাড় করতে হবে।'

'এত খাটলে একদিন ট'সে যাবে। তখন আমি দোকান নিয়ে কি করব?'

'চালাবে।'

'আমার দ্বারা হবে না।'

'বেচে দিও। আপাতত টসছি না। বরং বেশ আছি।'

'ছাই আছ? এত পরিশ্রম সহ্য হয় কারুর?'

'হচ্ছে তো। এবার তুমি হিসেবটা ক'রে ফেল। আমি একটু চৈতালির ঘরে যাচ্ছি।'

চৈতালির ঘর থেকে যখন ফিরে আসে, শোবার জন্যে সে তৈরি। চোখে ঘুমের ভার! বিছানায় শুতে শুতেই ঘুম।

স্মরজিতের হাত শরীরে অনুভব করে। ঘুম আরও ঘনিয়ে আসে।

প্রয়োজন মতো, অভ্যাস মতো, স্মরজিৎ জেগে জেগে প্রেম করে। ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যোগ দেয়।

তাতে স্মরজিতের অসুবিধা হয় না।

ঘরে আলো জ্বলে না। কেউ কাউকে দেখতে পায় না। চোখ বুজে প্রেম করে। স্মরজিৎ জেগে, ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে।

অনেক বছরের অভ্যাস।

এমনি করে একশ' তিন নম্বর সদানন্দ রোডে একটি বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার তার জীবন-নাটক অভিনয় করেছিল কলকাতার রঙ্গমঞ্চে, আদায় করছিল খানিকটা বৈচিত্র্য যা ছাড়া জীবন দুর্বিষহ, যদিও পরিবারের পুঁজির মধ্যে ছিল অনেকখানি ব্যর্থতা, একটি প্রতিভাবান পুরুষ-জীবনের লঘু আত্ম-অপচয় একটি কুমারী যুবতীর জীবনজোড়া অন্ধকার, অন্ধকারে সংগীতের আলো, একটি সাতচল্লিশ বছরের মহিলার পড়ন্ত জীবনের দুঃসাহসিক অভিযান, সব মিলে বেশ খানিকটা নাটক, অনেকখানি ফাঁকির মধ্যেও বেশ একটু শাঁসের আস্বাদ খানিকটা অর্জিত সঞ্চয়। এ সামান্য সঞ্চয়টুকুর ওপরও জুলুম চলতে লাগল সেই নামহীন ব্যাধির যার আক্রমণে কলকাতার গোটা বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবন ক্রমশ ক্ষীণতেজ হয়ে চলল ষাট দশকের

শেষভাগে। সদানন্দ রোড়ের পরিবারটির সঙ্গে এ ব্যাধির কোনও কারক-সম্পর্ক ছিল না ; কিন্তু গোটা সমাজদেহে যখন ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ল তখন এ ব্যাপারটির রেহাই পাবার কথা নয়। চৈতালি যে নামহীন যুবকটির কাছে দোকান রক্ষার আশ্বাস পেয়েছিল সে বুঝি এক দিন কোথায় হারিয়ে গেল : রবি, কানু, ভোলা, তাপসেরা চড়াও হয়ে বসল কলকাতার বুকের ওপর, ওদের সঙ্গে রহস্যময় সূত্রে মিশে গেল পুলিস, পার্টি, সংবাদপত্র, সাহিত্য, রাজনীতি এবং অতীত বর্তমান, ভবিষ্যৎ। কলকাতা কণিষ্ক হল। চৈতালির বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার প্রয়োজন ফুরাল। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ; রবি-কানু-ভোলা-তাপসেরা দোকানের আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল ; স্মরজিতের ছাত্রটি খুন হল ; কলেজ স্ট্রীট বই পাড়ায় ঘনিয়ে এল নৈরাশ্য। কলকাতার জীবনটা তালগোল পাকানো জটিল অন্ধকারে পরিণত হ'তে চলল। এ অন্ধকারের মধ্যে আসল কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না ; সেই কালো টাকার সাম্রাজ্য রইল অক্ষুণ্ণ, পয়সা-ওয়ালা মানুষদের দীর্ঘায়ত লোভ সংবৃত হল না এক ইঞ্চি, সিনেমা হলের সামনে লাইন বরং আরও লম্বা হল, রজনীগন্ধা বিক্রি হয়ে চলল রাসবিহারী এভিনিউ আর বৌবাজারে ; কেবল মানুষের মন হয়ে এল অন্ধকার, জীবন বিপন্ন, দিবস-রজনী আতঙ্কিত। বাঙালী মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি মুখ থুবড়ে পড়ে রইল কলুটোলার হাড় পাঁজর-বার-করা সড়কে।

সদানন্দ রোডের মহিলা এই ঘনায়িত অন্ধকারের কারণ জানতে পেল না, জানবার দরকার বোধ করল না, আরও দশজন নির্বাপিত মন মানুষের মতো সেও কাউকে কাউকে দোষী ক'রে নিজের কর্তব্য সমাপ্ত করল, অথচ বুঝতে পারল এক নিদারুণ ব্যাধি এগিয়ে আসছে, যার থেকে কারুর নিস্তার নেই, তাদেরও নেই, তার দোকানটিরও। দোকান তখন পরিবারের একমাত্র সম্বল, স্মরজিৎও কিছুক্ষণ দোকানে বসে, চৈতালি বসে দিনে তিনঘণ্টা, আর দোকানের মালিক ও কর্ত্রী

যে, তার কেমন পরাজিত মনে হয় নিজেকে, যা ছিল তার নিজস্ব সংগ্রামের সম্পদ, সবার সঙ্গে ভাগ ক'রে তার নিত্যকার প্রদেয় ঘরে তুলতে কেমন যেন মন উঠল না। সে আরও বেশি দম নিয়ে লেগে গেল দোকানটাকে দৃঢ় করতে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে, কখন কি হয়ে যায়, কখন, একদিন দোকানে বোমা ফাটে, অথবা চৈতালিকে কেউ আক্রমণ করে ছুরি বা পাইপ গান দিয়ে, কিংবা স্মরজিৎ আর ঘরে ফিরে না আসে, অথবা তার নিজের ওপরেই কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। অনেকগুলি ভয়, নামহীন, অপরিচিত এবং চেনা জানা ভয়, একসঙ্গে মনের অন্ধকারে কিলবিল করতে লাগল, সর্বদা, প্রতিদিন।

'মা, তোমার শরীরটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে,' চৈতালি বলল একদিন।

'এমন কিছু না,' সে লঘু করল ব্যাপারটা।

'না, মা। এত পরিশ্রম তোমার আর সইছে না। তুমি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ কখনও?'

'পরিশ্রম নয় রে, পরিশ্রম করতে তো ভালই লাগছিল,' মেয়ের কাছে কবুল করল এতদিনে। 'যা আমাকে কাবু করছে তা হল এই ব্যাধি। হাজার রকমের ভয় আমাকে পেয়ে বসেছে। এতদিন ভেবেছি আজ না হোক কাল, কলকাতার অবস্থা বদলে যাবে। এখন মনে হচ্ছে, বদলাবে, কিন্তু ভালোর দিকে নয়, খারাপের দিকে। কলকাতার মানুষদের বুঝি হার হয়েছে চিরদিনের জন্যে। দোকানটা পেতে বসেছিলাম আশা নিয়ে যে তোর জীবনটাকে সুন্দর কিছুর জন্যে, আলোকময় কিছুর জন্যে, তৈরি করে দেব। এখন মনে হচ্ছে তোকে আরও বিশ্রী কুৎসিত অন্ধকারে ফেলে চলে যেতে হবে আমাকে, আমাদের। এ ভয় আমি সহ্য করতে পারছি নে।'

'তুমি একটু বিশ্রাম নাও, মা।'

'বিশ্রামে কি আমার ভয় কাটবে? আমি তোর চেয়েও বেশি অন্ধকার দেখছি, চৈতালি। এত অন্ধকার সইতে পারছি না।'

স্মরজিৎ কিন্তু অন্ধকার দেখছে না, দেখছে নৈরাশ্য। অনেককে, সবাইকে, দোষ দিয়ে সে মনের ভাব লাঘব করছে প্রতিদিন। সব শালা চোর, সব শালা পাজি, সব শালা গুণ্ডা, সব শালা সর্বনাশের বাচ্চা। স্মরজিতের নালিশ শুনতে শুনতে ওর বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে আসে। সবাই যদি চোর, পাজি, গুণ্ডা, আর স্বার্থপর হয় তাহলে উপায়? তাহলে ব্যাধি সারাবে কে, অন্ধকার দূর হবে কার প্রয়াসে, কে আনবে ফিরিয়ে একটু, অন্তত একটু, আলো? তাহলে চৈতালি বেঁচে থাকবে কি নিয়ে, কিসের জন্যে, কিসের জোরে?

'তোমার চেহারা কি হয়েছে দেখেছ?' স্মরজিৎ প্রশ্ন করে।

'না।'

'এমনি ক'রে আর ক'দিন চলবে?'

'চলছে তো এখনও।'

'বাইরে কোথাও চলে যাও না মাসখানেকের জন্যে?'

'চৈতালি? দোকান?'

'চৈতালিকে নিয়ে যাও। দোকান আমি দেখবো।'

'ফিরে এসে দেখবো চিহ্নমাত্র নেই। তুমি দুমাসে সব তছনছ ক'রে দেবে।'

'যদি একদিন ম'রে যাও?'

'তখন আমার ভয়, ভাবনা কিছুই আর থাকবে না।'

'আমাদের কি হবে?'

'যতদিন পারো তোমরা অন্ধকারে শ্বাসপ্রশ্বাস নেবে। তার চেয়ে বেশি কিছু তো ভাবতে পারছি না।'

'নিজের দিকে একটু তাকিয়ে দেখো।'

'প্রয়োজন অনেকদিন ফুরিয়েছে,' প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানল সে।

এরই মধ্যে, এই ঘনায়িত অন্ধকারে, একদিন ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটল।

সকালবেলা স্মরজিৎ বলল, 'প্রতুল বসুকে মনে আছে তোমার?'

'কোন প্রতুল বসু?'

'বোম্বাই-এ যে বাস করে।'

'আছে।'

'কলকাতা এসেছে। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে আজ। সন্ধ্যেবেলা।'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে? এখানে?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'কেন হবে না।'

'খুব নাম করেছে আজকাল। মস্ত ব্যবসা। অনেক টাকা।'

'তাই তো প্রশ্নটা করেছিলাম।'

'এককালের বন্ধু ছিল তো? ওরা বিদেশে থাকে বছরের ছ'মাস। অত ক্লাস-কনসাস নয়।'

'ভালোই তো।'

'তুমি থাকছ তো বাড়ি?'

'আজ অনেক কেনাকাটি আছে। ন'টার আগে ফিরতে পারবো মনে হচ্ছে না।'

'তুমি থাকলে ভালো হ'ত।'

'উপায় কি বলো? তাছাড়া—'

তা ছাড়া, যা বলতে গিয়েও ও বলল না, তা ছাড়া আমার থেকে কি লাভ? তোমার এককালের বন্ধু, আজ ধনে-দৌলতে স্ফীতকায়, আসছে তোমার ভগ্নাবশেষ দেখতে। আর একটা ভগ্নাবশেষ তার না দেখলেও চলবে।

রাত ন'টার বেশ একটু আগেই সে ফিরে এল। সকালবেলার

কথোপকথন স্মরণ ক'রে নয়, কাজ শেষ হয়ে গেল বলে। দেখল দোকানে তখনও চৈতালি বসে।

'তোর বাবা কোথায় রে?'

'ওপরে। ওঁর বন্ধু প্রতুল বসু এসেছেন।'

'এখনও রয়েছেন?'

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'আমার জন্যে?'

'আসার একটু পরেই বলেছেন, তোমাকে একবার দেখতে চান।'

'আমাকে একবার দেখতে চান? কেন?'

'বলেছেন, পৃথিবীতে যে কয়টি প্রকৃত সুন্দর জিনিস দেখেছেন তার মধ্যে তুমি একটি। তোমাকে আর একবার দেখবার বড় ইচ্ছে প্রতুল বসুর। তুমি ন'টার সময় আসবে শুনে বললেন, আপনাদের অসুবিধা না হলে আমি অপেক্ষা করব।'

'কি যা তা বলছিস, চৈতালি!

'প্রতুল বসু তো তাই বললেন। মা, তোমাকে উনি কবে দেখে-ছিলেন?'

'মনে নেই। অনেক বছর আগে। বোধহয় পঁচিশ বছর হবে।'

'তখন তুমি খুব সুন্দর ছিলে।'

'হাতি ছিলাম। সুন্দরের কোনও মানে আছে? দেখ না, কি হয়েছে তার পরিণাম।'

স্মরজিৎ নেমে এল ওপর থেকে।

'তুমি এসে গেছ? প্রতুল তোমার জন্যে বসে আছে। বলছে, তোমাকে একবার না দেখে যাবে না।'

'পাগল। তোমরা পুরুষগুলি বদ্ধ পাগল।'

'তুমি চলে এসো। অনেকক্ষণ বসে আছে।'

সোজা ওপরে উঠে যাচ্ছিল ছাতে, যেখানে ওরা বসে গল্প করছে,

স্মরজিৎ, প্রতুল বসু। গিয়ে উঠল চৈতালির ঘরে। বড় আয়নাটা এ ঘরেই, যেহেতু চৈতালি অন্ধ। দাঁড়াল আয়নার সামনে। অনেকদিন পরে বিনা প্রয়োজনে। আয়নায় যাকে দেখতে পেল, সে কে? তাকে দেখে হাসি পেল। একজন মানুষ, একজন পুরুষ, মস্ত নাকি ব্যবসায়ী, বিরাট নাকি ধনী, তোমাকে দেখবার জন্যে বসে আছে ঘণ্টা দেড়েক। তোমাকে দেখবে বলে? তোমাকে? চলো, দেখিয়ে এসো তোমাকে। চোখ খুলে, চোখ ভ'রে লোকটা দেখুক।

বুকের মধ্যে কেমন একটা অস্থিরতা। হাতের আঙুলগুলি কাঁপছে। কাঁপা আঙুলগুলি পাউডারের কেসটা স্পর্শ করল। তুমি সাজবে? সেজেগুজে হাজির হবে লোকেটির সামনে? তাহলে তোমাকে আগে শাড়ি বদলাতে হয়, সারাদিনের ক্লান্তি, অনেকদিনের ক্লেদ শাড়িতে, বদলাতে হয় ব্লাউজ, ব্রা, এবং, আরও বদলাতে হয় শাড়ি-ব্লাউজ ব্রা'র নিচের তোমাকে। পাউডার কেসটা ঠিক ক'রে ডেসিং টেবিলে ফেলে রেখে সে সোজা চলে এল খোলা বারান্দায়, যেখানে অনেকক্ষণ কথা ফুরিয়ে গেলেও কথা বলছিল দু'জন পুরুষ, যাদের মধ্যে মিল নেই, অমিল নেই, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎও নেই, শুধু এ-টুকু ছাড়া যে তারা একদা বন্ধু ছিল, যেমন আদম ঈভ ছিল নিষ্পাপ, একদা।

প্রতুল বসু উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল।

'আমাকে নিশ্চয় আপনার মনে নেই। ছাব্বিশ বছর আগে প্যারিসে আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

'মনে আছে,' সে বলল, কণ্ঠস্বর সামলে, জেনেও যে সে কাঁপছে।

'অনেক কালের কথা। যেন অন্যকালের।'

সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

'শুধু একদিনের পরিচয় হয়েছিল আপনাদের সঙ্গে সেবার। আপনারা মস্কো থেকে লণ্ডনে যাচ্ছিলেন। আমি তখন প্যারিসে

ছিলাম মস্ত একটা দাঁও মারার আশায়। আমার ফ্ল্যাটে এসেছিলেন আপনারা। আমি আপনাদের ভার্সাই নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'মনে আছে,' সে স্বীকার করল, 'লুভ-ও দেখিয়েছিলেন। ঘোড়ার মাংস খাইয়েছিলেন মামার্তে একটা রেস্তোরাঁয়। লেফ্‌ট ব্যাঙ্কে রাস্তার ওপর আর্টিস্টদের ছবি আঁকা দেখিয়েছিলেন।'

'তাহলে তো সব মনে আছে আপনার। আপনারা নতুন প্যারিসে এসেছিলেন, ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখেছিলেন কৌতূহলী পর্যটকের মতো। আমি কিন্তু কেবল আপনাকেই দেখেছিলাম। আপনি বোধ হয় টেরও পান নি।'

পেয়েছিলাম ?

'সেদিন এক আশ্চর্য অনুভূত হয়েছিল আমার,' প্রতুল বসু বলে চলল ; কি ভীষণ খোলা লোকটার মন এবং জিহ্বা, ধনী না হ'লে হ'তে পারে এমন বেহায়া আত্মবিশ্বাস ? 'মনে হয়েছিল, এমন সুন্দর স্ত্রীলোক জীবনে কখনও দেখি নি, কখনও দেখবো না। পৃথিবীর বহু দেশে বহু বছর কেটেছে আমার, সুন্দর সব কিছুতে আমার আকর্ষণ। সত্যি বলছি, আপনাকে সেদিন যা দেখেছিলাম, অমন সুন্দর স্ত্রীলোক আর কোথাও কখনও দেখি নি। তাই আর একবার আপনাকে দেখবার ইচ্ছে ছিল বড় প্রবল।'

সে খালি চেয়ারটায় বসল।

'ওরকম অনুভূতি জীবনে কয়েকবারই আমার হয়েছে। মনে আছে, যেবার প্রথম তাজমহল দেখেছিলাম। মনে হয়েছিল, এমন সুন্দর জিনিস আর বুঝি কখনও দেখবো না। সে এক ব্যাপক নিবিড় অনুভূতি, মাতাল করা অনুভূতি। তেমনি হয়েছিল যখন প্রথমবার ফ্লোরেন্সে মিকেল এঞ্জেলোর ডেভিড দেখে। তিন চার দিন সব সময়ের জন্যে ডেভিড আমার মনে সম্মোহনের জাল ছড়িয়ে দিয়েছিল। আপনাকে দেখেও তাই মনে হয়েছিল। স্ত্রীলোক যে অত সুন্দর হ'তে পারে

জানতে পারি নি তার আগে, আপনার চেয়ে বেশি সুন্দর কাউকে তার পরেও আর দেখি নি।'

তার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হল, বেরিয়ে যাও, এখুনি যাও তুমি, কিন্তু কথাগুলি সে শুনে চলল, সাপ যেমন সাপুড়ের বাঁশি শোনে, তেমনি। অবশেষে সে বলল, 'মানুষের সৌন্দর্য তো ক্ষণস্থায়ী।'

'ক্ষণস্থায়ী না হ'লেও চিরস্থায়ী তো নয়,' মেনে নিল প্রতুল বসু। 'সে কথাই বলছিলাম স্মরজিৎকে। তাজমহল, ডেভিড, মোনালিসা চিরকালের সুন্দর। বার বার ফিরে যাওয়া যায় তাদের কাছে। কিন্তু জ্যান্ত মানুষ ক্ষয়ে যায়। তার সৌন্দর্য স্বল্পস্থায়ী। সে জন্যই অনেক বেশি মূল্যবান।'

'চব্বিশ বছর পরে ভগ্নস্তূপ দেখবার খেয়াল আপনার কেন হল?'

'স্মরজিৎও এ প্রশ্ন করেছিল। বলেছিলাম, তোমার স্ত্রী যদি জানতে চান, দেখবো বলতে পারি কি না। দেখুন, চব্বিশ বছর পরে আপনাকে তেমনটি দেখবো না, তা কি আমি জানতাম না? কিন্তু আপনি এখনও বর্তমান, চব্বিশ বছর আগে আপনি আমাকে এক অপূর্ব আনন্দের, সুখের অনুভূতি দিয়েছিলেন। আর্টিস্ট হলে হয়তো আপনার ছবি এঁকে রাখতাম। সে অনুভূতি আমার ইন্দ্রিয়গুলিতে আজও জীবিত। এবং এজন্যেই আমার কাছে আপনার একটা মূল্য রয়ে গেছে। সে সুন্দরের অনুভূতি আর আপনি এক নন। তখন যদি-বা কিছুটা ছিলেন, আজ একেবারেই নন, কিন্তু তবু আপনাকে কেবল ধন্যবাদ দিতেও একবার দেখবার বাসনা ছিল। ঠিক হয়তো বোঝাতে পারলাম না, কারণ ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাবার জিনিস এটা নয়। ভগ্নস্তূপ দেখতে আমি আসি নি, আপনি তা নন-ও। অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে, সময় নষ্ট করলাম। এবার অনুমতি দিন, উঠি। কাল সকালে আমি দিল্লী চলে যাচ্ছি। আজ এ সময় আপনাকে না দেখতে পেলে আর হয়তো দেখতে পেতামই না। আচ্ছা, এবার

আসি।' চলে যাবার উপক্রম ক'রে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে প্রতুল বস্থ আবার বলল, 'আপনার নাম কিন্তু আমার মনে নেই। স্মরজিৎকে জিজ্ঞেস করতে সংকোচ হচ্ছিল। আমি বড্ড নাম ভুলে যাই। কি যেন আপনার নাম···সমীতা? না, সমীতা নয়, ওরকম একটা কিছু। বলতে চাইছেন না? ঠিক আছে, স্মরজিতের কাছে পরের বার জেনে নেব। স্মরজিৎ আমার নাম ভুলতে পারে, আপনার নাম ভুলবে না···'

লোকটা তাহলে শেষ পর্যন্ত চলে গেল। স্মরজিৎ ওকে রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়িতে তুলে দিল। সে চলে গেল, স্মরজিৎ ওপরে উঠে গেল, চৈতালি ঘরে চলে গেছে, দোকান বন্ধ করেছে রেণুর মা, তবু সে দোকানে বসে রইল, মনের কোথায় যেন পাখি গাইছে, হালকা ঝরনা যাচ্ছে বয়ে, কে যেন কোথায় লুকিয়ে থেকে বার বার বলছে, আমি সুন্দর ছিলাম, আমি, আমি, আমি; আমাকে দেখে এই লোকটা, সে যেই হোক, মানুষ তো, পুরুষ তো! তাজমহল আর ডেভিড দেখবার মতো অনুভূতি পেয়েছিল, আমি সুন্দর ছিলাম; আজও, এখনও, এখানেও, আমি সুন্দর থাকতাম, যদি এ সমাজটা অন্য সমাজ হত, এত কঠিন নয়, খামখেয়ালি নয়, আর একটু মানবিক, কমনীয়, যদি কলকাতায় মধ্যদিনে এমন অন্ধকার নেমে না আসত, যদি প্রতিদিনের জীবনে ভয়, সন্দেহ, আতঙ্ক আর নৈরাশ্য ভিড় না জমাত, তাহলে আমি আজও সুন্দর থাকতাম, লোকটা এবং অনেক লোক আজও আমার দিকে দেখত তাকিয়ে, তাদের, এই লোকটার চোখ চকচক করত, মুখ রঙিন দেখাত, এ লোকটার প্রশস্ত কপাল খুশিতে উজ্জ্বল হত। এ সব ঘটল, অঘটনের পর অঘটন, বহু বছর ধরে, একের পর এক, একের সঙ্গে এক এবং একাধিক; গড়ে উঠল ব্যাপক, গভীর ষড়যন্ত্র, আমার এবং সকলের সকল সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে। সব কিছু সুন্দরের বিরুদ্ধে, যে সুন্দর সহজ স্বাভাবিক, যাতে জীবনের জন্মগত অধিকার। সে সৌন্দর্য ছিল আমার, আমি

তা নিয়ে জন্মেছিলাম, তাতে ভেজাল ছিল না, সে সৌন্দর্য সিনথেটিক ছিল না, তাই এই লোকটা সারাদিন ধরে দেখেছিল, সে নন্দন অনুভূতি আজও নাকি তার মনে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। সে তো আমাকে দেখে নি, আমি, যার নাম পর্যন্ত তার মনে নেই, ব্যক্তি হিসেবে উহ্য, আমার হৃদয় মন দেহ রক্ত স্নায়ু নিয়ে যে আমি, যার নাম আছে একটা, অন্তত ছিল, এবং পরিচয় এবং মন, দেহ, ইন্দ্রিয়, সে-আমাকে লোকটা দেখে নি চব্বিশ বছর আগে একটা পুরো দিন ধ'রে, দেখেছিল আমার মধ্যে সুন্দরকে, যেমন মানুষ দেখে তাজমহল, ডেভিড, মোনালিসা অথবা, এবং, বর্ষাদিনের মেঘ, শরৎ দিনের আকাশ, কচি নতুন ঘাস, ফুল। তাই এত অনায়াস ঔদাসীন্যে, সহজ নিঃসঙ্কোচে লোকটা বলে যেতে পারল, সুন্দর তাকে কি গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল, সে বলল আমাকে নয়, যে-আমার পা কাঁপছিল, বুকের মধ্যে যন্ত্রণা, তাকে নয়, একদা-সুন্দর-কোনও-একজনকে, সুন্দর-কোনও-কিছুকে, যেমন, কচি সোনালি পাতা, নামহীন ফুল, অস্তরাগ আকাশ ; যেমন, শিশুর হাসি, মায়ের স্নেহ, বন্ধুর প্রীতি, দয়িতের প্রেম ; যেমন, সুস্থ সহজ বেঁচে থাকা. বেঁচে আছি অনুভব করা. কাউকে না ঠকিয়ে, কারও দেহের রক্ত চুষে না খেয়ে, কাউকে অপমান আঘাত না ক'রে, অনেকের নিষ্পেষিত অস্থিমজ্জার ওপর কতিপয়ের বৈভব না তৈরি ক'রে, না মার খেয়ে, না মেরে, আতঙ্কে অস্থির হবার বিনা প্রয়োজনে, ভয় না পেয়ে, সুন্দর বেঁচে থাকা।

হাসি পেল, হেসে উঠল সে, একা একা, বন্ধ দোকানে, রাত এখন দশটা, স্মরজিৎ আজ একাই হিসেব মিলাক, আমার অন্য হিসেব, যে-হিসেব মিলছে না, মিলবার নয়। আমি, এই যে আজ আমি একদা-সুন্দর-বুঝি-বা প্রস্তরমূর্তির ভগ্নস্তূপ, একদিন, অনেকদিন আগে, আমি সুন্দর ছিলাম, লোকে বলত, মানুষের অনুভূতি কি দুর্বলভাবে ভাষার দাসত্ব করে, লোকে বলত রাজকন্যা, পটের বিবি, লক্ষ্মীপ্রতিমা, স্মরজিৎ

মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত আমার নিরাবরণ দেহে, বলত, হ্যাঁ, মনে আছে, বলত, 'তোমাকে এমনি ক'রে ধরে রাখবার জন্যে আমি সম্রাট হলে সাম্রাজ্য বিলিয়ে দিতুম.' যে-অবস্থায় আমাকে প্রতুল বসু দেখে নি, দেখলে হয়তো আর এক অহল্যার জন্ম চাইত বিধাতার কাছে আমার সে সৌন্দর্য স্মরজিতের আজ আর মনে নেই, আমারও ছিল না, সারাদিনে একবারও নিজের চেহারা দেখবার অবকাশ বা প্রয়োজন নেই আমার, স্মরজিৎ এখনও মাঝে মাঝে আমাকে দেখে, আমার মাথায় টাক প'ড়ে এসেছে, বর্ণ হাতুড়ি পেটা পোড়া তামা, কোমরে একবস্তা বাড়তি মাংস, এটাই সত্য, এই শ্রীহীনতা, এই আজকার সত্য, জীবনে আজ সবচেয়ে দাপুটে, তার জুলুম সবচেয়ে বেশি। স্মরজিৎ ভুলে গেছে আমি সুন্দর ছিলাম, ভুলে গেছি আমিও, এবং আরও সবাই, যারা একদিন লোভী চোখে তাকাত, ঘুরঘুর করত আমার পেছনে, যাদের মাথা নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার সামান্য করুণার অন্বেষণে। সবাই ভুলে গেছে কারণ আমরা আর কেউ সুন্দর নই, একবার তাকিয়ে দেখ, হে ভগবান, আমাদের পানে, কি বীভৎস কুৎসিত আমাদের দেহ, মন, ভাবনা, কামনা, দাবি, লোভ, ধ্যান, তাকিয়ে দেখ এই আমাদের শহরটাকে, আমাদের জীবনযাত্রাকে, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে। সবটুকু সৌন্দর্য নিংড়ে নিয়েছে একটা বিরাট রাক্ষস, আমি তার নাম জানি নে, তাকে ঠিক চিনিও নে, তবু জানি সে লণ্ডভণ্ড করছে আমাদের জীবন, শুধু আমাদের এ কলকাতায় নয়, আরও অনেক ব্যাপক, অনেক গভীর, অনেক সর্বগ্রাসী তার জুলুম। এই চক্রান্ত চলেছে সারা কলকাতায়, সারা দেশে, না-কি সারা পৃথিবীতে ? জীবনে যা কিছু সুন্দর তাকে লুটে পুটে খেয়ে নিয়ে এক বিরাট বীভৎস কুৎসিত জঘন্য ক্লেদাক্ত অসভ্যতা নিয়ে মানুষ বাস করছে, ঘরে ঘরে সহজ স্বাভাবিক সুন্দরের অভাব মেটাচ্ছে লোভে, নৈরাশ্যে, প্লাস্টিকে।

প্রতুল বসু একটা বৃহৎ পরিহাস বহন ক'রে নিয়ে এল আজ এখানে, স্মরজিৎ বুঝতে পারল কিনা জানি নে, কিন্তু আমি পারলাম, তাই আমি বসে আছি একা আজ এখানে, এই বন্ধ দোকান ঘরে, একটু সময়ের জন্যে, এক্ষুনি আর পারব না, আমি আবার মিলিয়ে যাবো অসুন্দরে, কুৎসিতে, যেখানে আমার, আমাদের মতো সবার, বাস। তোমার পরিহাস বুঝতে পারলাম, প্রতুলবাবু, বুঝতে পারলাম, আজ এই স্বল্প সময়ে, কেন বিদেশী ছেলেমেয়েরা হঠাৎ রাস্তায় জনচক্ষুর সামনে, উলঙ্গ হয়, কেন চুলদাড়িতে অর্ধেক পশু সেজে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়, কেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন না ক'রে লাইব্রেরী পোড়ায়, কেন কলকাতায় লোকেরা পরীক্ষার অব্যবস্থা ভণ্ডুল করে, কেন মহাপুরুষরা সবাই তাদের কাছে কণিষ্ক, কেন তারা মারে, মরে, আঘাত হানে, আহত হয়। বিরাট বিপন্ন কুৎসিত তাদের জীবনকে অন্ধকার করেছে, সহজ, স্বাভাবিক সুন্দরের পথ তারা জানে না, অথচ এ কুৎসিত তাদের হাতে তৈরি নয়, তৈরি তোমাদের হাতে প্রতুল বসু, তুমি, তোমরা, আমরা, আরও অনেক অনেক, অনেক মানুষ এদেশে, বিদেশে সবদেশে, যাদের হাতে সুন্দর অসুন্দরে, কুৎসিতে পরিণত হয়েছে, যারা তৈরি করেছে বিরাট বীভৎসের বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্র, তারা মারছে, যারা একদিন সুন্দর ছিল, যারা আজও সুন্দর থাকতে চায়, তাদের।

একটা প্রচণ্ড পরিহাসের অর্থ বুঝতে পেরে আবার সে হেসে উঠল। হাসির চাপে তার পাংশু চোখ ভ'রে উঠল জলে।

ওপর থেকে চৈতালির ডাক শোনা গেল: 'মা তুমি দোকানে বসে আছ কেন?'

দিল্লীর একত্রিশ লক্ষ মানুষের মধ্যে হরনাম সিংকে ক'জনেই বা চেনে, কিন্তু আমার সঙ্গে তার পরিচয় অনেকদিনের, এবং গভীর। সে আমার গাড়ি চালায়, অতএব, তার দ্বারা প্রতিদিন আমি চালিত হয়ে থাকি। ড্রাইভার এবং গাড়ির মালিকদের মধ্যে এক ধরনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গ'ড়ে ওঠে, অনেকে জানেন। তা ছাড়া মানুষ হিসেবে হরনাম সিংকে আমি শ্রদ্ধা করি। প্রথমত, তার ছ' ফুট দু'ইঞ্চি মেদহীন দেহের সোজা, তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব; দ্বিতীয়ত, তার মুখে অবিরাম হাসি, প্রায়ই যা সরব এবং শিশুর মতো সরল; তৃতীয়ত, তার স্বভাবের আকর্ষণীয় নম্রতা, এবং প্রধানত, তার জীবন-চেতনার বলিষ্ঠ আশা প্রবণতা। হয়তো একটু বাড়িয়েই বলছি, কারণ হরনাম সিংকে আমি অনেকাংশে এক অসাধারণ মানুষ বলে মনে করি।

কারণ আছে। লোকটির আনুগত্যে ফাঁক নেই। প্রয়োজনে, বিপদে সর্বদা এক পায়ে খাড়া। চুরি কারচুপির ধার ধারে না। টাকার চেঞ্জ বেশির ভাগ সময়ে ফেরত দেয়। লোভ-লালচ কম। পাংচুয়াল। গাড়িটাকে সত্যিকারের ভালোবাসে, যত্ন করে। ভালো চালায়, সাবধানে, গা বাঁচিয়ে। আপনার যদি ড্রাইভার থাকে, হয়তো আপনি ইতিমধ্যেই হিংসে করছেন। হ্যাঁ, হরনাম সিংকে ভালোবাসার কারণ আছে।

ওকে নিয়ে যে গল্প লেখা যায়, কখনও ভাবি নি। হঠাৎ দেখা গেল হরনাম সিং সাহিত্যের সামগ্রী। অর্থাৎ ওর জীবনবেদে এমন কিছু ধরা পড়ল, যা যুগপৎ ভাস্বর ও ব্যথা-ম্লান। মধ্যাহ্ণের সূর্যের ওপর হঠাৎ বর্ষার মেঘ নেমে আসে, দেখে থাকবেন। তেমনি।

"ছেলেটা চলে গেল," গাড়ি চালাতে চালাতে বলল হরনাম সিং। "ছেলেটা চলে গেল।" বলে উঁচু পর্দায় হেসে উঠল। চোখ দুটো জলে ভরে এল।

"যেতে দাও," বিজ্ঞের উপদেশ দিলাম আমি। "তুমি তো অনেক করেছ। এবার দেখুক জীবনটা এমন সহজ নয়। দেখুক কত ধানে কত চাল।"

চোখেমুখে হেসে উঠল আবার হরনাম সিং। বলল, "চলে গেল, দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু এই হুজুর, লেখাপড়া করল না। ড্রাইভারের ছেলেই রয়ে গেল। ভদ্রলোক হল না। আদমি হল না।"

পাতিয়ালা রাজ্যের যে গ্রামে হরনাম সিংএর জন্ম হয়েছিল তেতাল্লিশ বছর আগে, সেখান থেকে চার ক্রোশ দূরে ছিল মিড্‌ল্‌ স্কুল, যেখানে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত বাল্যকালে ও পড়েছিল। বাপও গরজ করে নি, নিজেরও মন ছিল না, তাই যেদিন স্কুল যাওয়া বন্ধ ক'রে বাপের পেছন পেছন মাঠে গিয়ে হাজির হল, কেউ অবাক হয় নি, তিরস্কার করে নি, দুঃখ পায় নি। মাঠের কাজেও মন বসল না হরনাম সিংএর, তাই ষোলো বছর বয়সে একদিন হাজির হল পাতিয়ালা শহরে, কাজ পেয়ে গেল এক মোটর মেরামতের গ্যারেজে। তখন সবেমাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। গ্যারেজে কাজ করতে করতে শিখে নিল গাড়ি-চালনা। বছর খানেক পরে ভর্তি হল মিলিটারীতে। ট্রাক-ড্রাইভার। পাঁচ বছর ধরে অনবরত অসংখ্য গাড়ি চালাল হরনাম সিং—ভারী লরী, জীপ, এমনি গাড়ি, ভারতবর্ষে, বর্মায়, সিংহলে। যুদ্ধের পরও বছর দুই মিলিটারীতে কাজ করার পর, দেশ যখন ভাঙল এবং স্বাধীন হল, হরনাম সিং ছাড়া পেয়ে চলে এল দিল্লীতে, কাজ পেল ভারত সরকারের এমন এক বিভাগে যেখানে দিনে শ' দুই মাইল তাকে গাড়ি চালাতে হয়, কখনও রাত্রি আটটা থেকে ভোর

চারটে, কখনও ভোর চারটা থেকে বেলা বারোটা, কখনও বারোটা থেকে রাত আটটা। অর্থাৎ সিফ্‌ট ডিউটি। এরই মধ্যে পার্ট-টাইম কারুর না কারুর ড্রাইভারীও সে ক'রে এসেছে। এখন বছর পাঁচেক ধরে লেগে আছে আমার সঙ্গে।

চমৎকার ইংরেজী বলে। ভাষাটা যেহেতু কষ্ট ক'রে শিখেছে, যুদ্ধের সময় গোরা সৈন্যদের সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটিয়ে, তাই চর্চা রাখবার চেষ্টা প্রচুর, যাতে অব্যবহারে বিদ্যা হারিয়ে না যায়। অতএব, আমার ও আমাদের সঙ্গে বেশির ভাগ কথা বলে ইংরেজীতে। অথবা হয়তো বুঝে নিয়েছে আমার হিন্দীজ্ঞান ওর ইংরেজীর চেয়ে এমন কিছু প্রখর নয়। আমি যদি হিন্দী বলতে পারি, হরনাম সিং-ই বা কেন ইংরেজী বলবে না?

সুতরাং: "হোয়াই গো বিগ গ্যারেজ! অল চোরস্‌। আই নো ম্যান ইরউইন রোড। গুড মেকানিক। নো লেগ।"

"পায়ের মে কেয়া হুয়া?"

"হী হ্যাস ভেরী ব্যাড্‌ অ্যাকসিডেন্ট। ট্যাক্সি হিট। ভেরী ব্যাড ট্যাক্সি ম্যান। হী নো কনসাস। ট্যাক্সিম্যান কিপ হিম অন রেললাইন। ওয়ান লেগ গন। কাম রেলগাড়ি, সেকেণ্ড অ্যাকসিডেন্ট, টু লেগ গন। বাট ম্যান অ্যালাইভ। টুক্‌ টু হসপিতাল। গেট ওয়েল। নাউ, বোথ আইরন লেগ। হী গুড মেকানিক অন ইরউইন রোড।"

"কাম করতা পারতা হ্যায়।"

"হোয়াট ডু? গড্‌ ক্রুয়েল, ম্যান মাস্ট লিভ। নো ম্যারেজ নো বোথ লেগ, হোয়াট ম্যারেজ?"

"উসকো কোন শাদী করেগা?"

"দ্যাট আই সে। নো গার্ল ম্যারী ম্যান ট্যু লেগ গন। গুড মেকানিক।"

গরীবের জন্যে হরনাম সিংহের প্রাণ সর্বদা দুর্বল। বড়ো কারখানায়

গাড়ি মেরামতে ভীষণ আপত্তি। যদি বলি, বড় কারখানায় কাজ ভালো, তা ছাড়া, ওদের দায়িত্ব থাকে, নুক্স হলে আবার গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়, হরনাম সিং জবাব দেয় :

"দে রীচ। মোর রীচ মোর থীভ্। পুওর ম্যান মেক ট্যু পাইস।"

বলেইছি তো, লোকটা ভালো। হৃদয়বান। দরদ আছে।

সরল, সহজ। বাড়িতে ঢুকে সোজা শোবার ঘরে চলে আসে চাবির জন্যে। গিন্নী রাগ করেন। আমার কিছু বলতে সরম লাগে। হরনাম সিংএর কুছ-পরোয়া নেই। খিদে পেলে সোজা রান্নাঘরে গিয়ে পাচকের কাছে খাবার চেয়ে নেয়। অনুমতির অপেক্ষা না করে, টেলিফোন ব্যবহার করে। বাজার করতে দিলে উল্টো-পাল্টা করে আনে। বলেইছি তো, লোকটা সহজ, সরল। বাড়ি এসে প্রথমে খবরের কাগজ। কাগজখানা নিয়ে লাউঞ্জে বেতের চেয়ারে বসবে। পকেট থেকে বার করবে চশমা। এটা আমাকেই কিনে দিতে হয়েছে। ইচ্ছে ছিল, যে ডাক্তার কুড়ি টাকা ফী নিয়ে আমার চোখ দেখে তার কাছে যাওয়ার। পাঠিয়েছিলাম সফদরজং হাসপাতালে।

"হসপিতাল ডক্টর নো গুড।" আপত্তি করেছিল হরনাম সিং।

"বহুত গুড্ হ্যায়।" বলেছিলাম আমি।

"ডক্টর শেঠী ভেরী গুড।"

"বিশ রূপায়া লেতা হ্যায়।"

"হোয়াট, ট্যুএন্টি রূপি ফর আই ?"

অর্থাৎ কুড়ি টাকা বড়ো, না আমার চোখ ?

কিন্তু হসপিতালেই যেতে হয়েছিল। চশমার প্রেসক্রিপশন নিয়ে হাজির হল আমাদের জানাচেনা দোকানে। বিল দেখে অবাক্ হয়েছিলাম। বাইশ টাকা!

"আরে এতনা রূপায়াকা চশমা লিয়া ?"

"অন্‌লি ট্যুএন্টিটু রূপি।"

সেই বাইশ টাকার চশমা চোখে লাগিয়ে হরনাম সিং কাগজ পড়ে। বেশ বড়ো গলায়। বানান ক'রে ক'রে। এবং টীকার সঙ্গে।

"দি প্রাইম মিনিস্টার টু ডে টোল্ড পার্লিয়ামেণ্ট দ্যাট প্রাইসেস অব এ-এ-সে-স-ন-সিয়াল কমো-কমো-ডি-আই-টি-ই-এস উইল বি ক-ন্ ট্রো-ল-ড। হোয়াট সে! প্রাইস গো আপ মর্নিং ইভিনিং, পটাটো এইট্টি পয়সা কিলো, পুওর পিপল হাংরি, হোয়াট প্রাইম মিনিস্টর! সী টোল্ড দি লোক—সভা…

নেতাজী নগরে হরনাম সিংএর সরকারী ফ্ল্যাট। একতলায়, দুখানা ঘর। পরিবার ছোট, স্ত্রী, দুটি ছেলে। সহজ সরল জীবন, তাই দু'ঘরের এক-খানাই যথেষ্ট; অন্যখানা হরনাম সিং ভাড়া দিয়েছে, যেমন অনেকে দিয়ে থাকে, যদিও আইন-কানুনে বাধে। চাপ দিলে যত টাকা ভাড়া পেতে পারত তার চেয়ে বেশি নেয় নি, কারণ তার লোভ-লালচ কম। সুখী পরিবার। হরনাম সিং দিন রাত্রির তিন ভাগ সময় বাইরে, সংসার চলে স্ত্রীর পরিশ্রমে, গোলগাল মেয়েমানুষটি মুখরা নয়, শ্রম কাতর নয়, অপ্রয়োজনে অর্থব্যয়ে অরুচি। ছোট ছেলে সৎনাম মার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, স্কুলে যায়, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলে। বড় ছেলে নানক।

উনিশ বছরে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। বাপের মতোই দীর্ঘ, বড়শির-ছিপ, মুখে কিন্তু হরনামী হাসি নেই, কেমন একটা কঠোর কাঠিন্য; তবে চোখ দুটি জলের মতো তরল। নতুন দাড়ি-গোঁফে হঠাৎ একটু বেশী-বয়স দেখায়, ভালো ক'রে তাকালে অবশ্যি বোঝা যায় ওটা বাইরের।

ছেলেকে নিয়েই হরনাম সিংএর যা কিছু সমস্যা। ছেলে নিয়ে সমস্যা নেই এমন বাপ কজন আছেন ভারতবর্ষে? অতএব, হরনাম সিংএর পুত্র-প্রব্লেম এমন কিছু গল্পের উপাদান নয়। উপাদান এ জন্যে সে হরনাম সিং তার সন্তান, প্রথম সন্তান এবং পুত্র, নানক সিংকে চেনে না।

"সাব্", একদিন হরনাম সিং বলেছিল আমায়, বছর দুই আগে, "সাব্, একটা আর্জি আছে।"

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে, যোগ দিয়েছিল, "মাই সন।"

"কি ব্যাপার ?"

"ডিফিকাল্ট বয় মাই সন।"

"সব 'সনই' ডিফিকল্ট।"

"হী গুড বয়। বাট নো রীড।"

"কোন ক্লাসে পড়ে।"

"ক্লাস এইট। একজামিন অল্ পাস। বাট নো ওয়ার্ক।"

"না পড়েই পাস করে ? তাহলে তো বুদ্ধি আছে।"

"ওয়ার্ক অন্‌লি হোয়েন একজামিন নিয়ার।"

"সবাই তো তাই করে দেখি আজকাল।"

"নট অল সাব্। বাপীসাব (অর্থাৎ আমার ছেলে) অলওয়েজ ওয়ার্ক। রীড মেনি বুক।"

"স্কুলটা পাস করিয়ে দাও, তারপর একটা চাকরি—"

"নো সাব্", হঠাৎ অসম্ভব জোর দিয়ে বলে উঠেছিল হরনাম সিং। "আই ভেরী পুওর ম্যান। নো এডুকেশন, অন্‌লি ক্লাস ফাইভ। মাই অল রিস্তেদার নো এডুকেশন। আই ওয়ান্ট মাই সন গুড এডুকেশন। আপ টু বি. এ.।"

সেদিন আমি হঠাৎ নতুন চেহারা দেখতে পেলাম হরনাম সিংএর। লোকটা দিনরাত গাড়ি চালায়, পরিশ্রমের শেষ নেই। সবসুদ্ধ, মাইনে, বাড়ি ভাড়া, বাড়তি রোজগার নিয়ে, শ' দুই টাকা মাসিক উপার্জন। ছেলেকে বি. এ. পাস করানো ওর একমাত্র দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা। পাঞ্জাবী সর্দারের স্বপ্ন।

হরনাম সিং বলেছিল, "আই ভেরী পুওর ম্যান, সাব্। বাট ভেরী হ্যাপী। মাই ফ্যামিলি অল পীস। আই নো বরো মানি

এনিবডি। সিম্প্ল্ লাইফ। খানা পরনা অল সিম্প্ল্। অন্লি বয় ভেরী ডিফিকাল্ট।"

"ডিফিকল্ট কিসে?"

"হী নো রীড; গুড বয়। বাট নো ওয়ার্ক। অলওয়েজ সিনেমা। অলওয়েজ নিড মানি। হোয়েয়ার আই গেট মানি?"

"ঠিক তো। চাইলেই ছেলেকে পয়সা দিতে হবে?"

"হোয়াট ডু সাব? নো গিভ্ মানি, মাচ্ ট্রাব্ল্। হী নো ঈট, গো এওয়ে ফ্রম হোম, ফাইট উইথ মাদার।"

"তুমি শাসন করতে পারো না?"

"আই টেল হিম সাব। নো হীয়র। ভেরী ডিফিকাল্ট।"

একদিন যা কখনও ঘটে না তাই ঘটল। হরনাম সিং এল আধ ঘণ্টা লেট ক'রে। প্রচুর মাপ চেয়ে যা বলল তার মানে হ'ল: রেডিয়ো কিনতে চাঁদনীচক গিয়েছিল। জানাচেনা এক সর্দার কিছু কমিশনে মারফি রেডিয়ো দেবে বলেছিল, তাই যেতে হ'ল চাঁদনীচকে।

"রেডিয়ো কিনলে কেন হঠাৎ?"

"হোয়াট ডু সাব। বয় ওয়াণ্ট রেডিয়ো। নো রেডিয়ো, নো রীড। নো গো স্কুল।"

রেডিয়ো না কিনে দিলে ছেলে স্কুলে যাবে না। তাই তিনশ' বারো টাকা দিয়ে হরনাম সিংকে রেডিয়ো কিনতে হ'ল।

"রেডিয়ো তো ভালো জিনিস। গান শুনবে, ভালো ভালো বক্তৃতা শুনবে।"

"হোয়াট গুড্ সাব? আই ভেরী পুওর ম্যান। নো লাইক রেডিয়ো। বাট বয় ওয়াণ্ট। নো রেডিয়ো, নট গো স্কুল।"

এমনি ক'রে নানক সিং একদিন একজোড়া টেরিলিন শার্ট আদায় করল। পায়ের সঙ্গে কামড়ে লেগে থাকা ট্রাউজারও। 'নো টেরিলিন শার্ট নো গো স্কুল।"

বাপকে স্কুলে না যাবার ভয় দেখিয়ে ছেলেটা দিব্যি সব কিছু বাগিয়ে নিচ্ছে। এ এক নতুন ধরনের ব্ল্যাক-মেল। একদিন বলতে হ'ল :

"ও যা চায় তাই যদি দাও, পড়াশোনা মাথায় উঠবে।"

"হোয়াট ডু সাব ?"

"দেবে না।"

"দেন হী নট গো স্কুল।"

"বেশ তো, না পড়তে চায়, স্কুল ছাড়িয়ে দাও। তাগড়া জোয়ান ছেলে, কাজকর্ম শিখে রোজগার করুক।"

"নো সাব। ইন মাই ভিলেজ, নো গ্রাজুয়েট। নো রিস্তিদার এনি এডুকেশন। হী মাস্ট পাস বি. এ.।"

"এমনি ক'রে ক'দিন সামলাবে ?"

"বয় ভেরী গুড, সাব। আফ্‌টার রেডিয়ো, হী রীড। গুড রেজাল্ট ইন ইনতিহান।"

"কি ক'রে জানলে ? ছেলে বলেছে ?"

"আই গো টু প্রিন্সিপাল। হী সে বয় গুড। বাট নো ওয়ার্ক।"

তারপর শুনলাম ছেলের জন্যে হরনাম সিং এক মাস্টার ঠিক করেছে, মাইনে মাসে ত্রিশ টাকা। অঙ্কে কাঁচা। প্রথম চেয়েছিল আমার ছেলের কাছে এসে অঙ্ক শিখুক। নানক রাজী হয় নি। অগত্যা গৃহশিক্ষক।

নানক এখন ক্লাস টেনে পড়ছে। প্রায়ই হরনাম সিং বলে, আর একটা বছর পরেই সে কলেজে যাবে। কোন কলেজে পাঠাবে জিজ্ঞেস করে। আমার ছেলে সেণ্ট স্টিফেন্‌স্‌-এ যায়। নানক কি পড়তে পারবে ঐ কলেজে ? অবশ্য যদি ভালো রেজাল্ট করে ? খরচ কি অনেক বেশি ? বেয়াদপি মাপ ক'রে কতো খরচ হয় আমি কি বলবো ? মাসে একশ' টাকা ? মাই গড, অত টাকা কোথায়

পাবে হরনাম সিং? রামজাস কলেজে কতো খরচ? বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি কখনও আমার ছেলেকে নিয়ে যায়, হরনাম সিং এক একটা কলেজে ঘুরে বেড়ায়। ভেতরে গিয়ে ক্লাসরুমের বাইরে একটুক্ষণের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের দিকে প্রলুব্ধ বিস্ময়ে তাকায়। তাদের মধ্যে বোধ করি দেখতে পায় নিজের ছেলেকেও।

"সাব, অল কলেজ বয় স্মোক। ভেরী ব্যাড।"

আমাকে নীরব দেখে, "বয় অ্যাণ্ড গার্ল অল-ওয়েজ একাঠ্ঠা। ভেরী ব্যাড।"

"একসঙ্গে পড়ে যে।"

"বাট্ হোয়াই ওয়াক একাঠ্ঠা অন রীজ?"

আমি হেসে ফেললাম।

"নো লাফ্ সাব। বাপীসাব অলসো উইথ মেনি গার্ল।"

আমি আরও জোরে হেসে উঠলাম।

"বাট বাপীসাব ভেরী গুড। পহলে পহলে হী স্মোক। আই নট টেল ইউ, বাট ইন দি কার হী স্মোক।"

"জানি।"

"আই আস্ক হিম, হোয়াই স্মোক। সাব নট লাইক ইউ স্মোক। বাপীসাব সে আই টেল মাই ফাদার। হী নট অবজেক্ট।'

"ঠিক।"

"বাট নাউ হী নট স্মোক। নেভার। আই আস্ক, হোয়াই নট স্মোক হী সে ফাদার নট লাইক সো আই নট স্মোক। উইথ মানি আই বাই বুক।"

"তোমার ছেলে তো স্মোক করবে না।"

"উই শিখ নো স্মোক। বাট হী গো উইথ গার্ল।"

"ভালোই তো। নিজে বি. এ. পাস করবে, বি. এ. পাস একটি মেয়েকে বিয়ে করবে।"

হরনাম সিংএর মুখে এক গাল হাসি। যা বলল তার মানে হ'ল, সাহেব, দেশটা বদলে গেছে। কতো নতুন নতুন বাঁধ, কলকারখানা, স্কুল কলেজ তৈরি হচ্ছে। আমি চাই নানক নতুন আদমি হোক। নতুন জমানার নতুন আদমি। "আই নো এডুকেশন। বাট্ আই ভেরী হ্যাপী। আই ওয়ান্ট নাথিং ফ্রম বয়। হী লিভ্ আপনা লাইফ। আই টেল, ইউ ডু নাথিং ফর মি। বাট্ বি গুড্ আদমি। নো এডুকেশন, নো আদমি। নো আদমি অব নিউ ইণ্ডিয়া।"

"তুমি তো এতোসব বলছ। তোমার ছেলে কি ভাবছে খবর রাখো ?"

হরনাম সিং কথার মানে বুঝতে পারল না।

"ছেলেকে জিজ্ঞেস করো সে কি করতে চায়।"

"নো সাব। আই নট টক টু হিম।"

"সে কি ? ছেলের সঙ্গে কথা বলো না ?"

কি ক'রে বলবে ? হরনাম সিং দিনরাতের তিনভাগ বাইরে। বাড়িতে কতোটুকু সময়ই বা কাটায় ? ছেলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎই বা কতোটুকু ! তাছাড়া ছেলে প্রায়ই বলে হরনাম সিং কিচ্ছু বোঝে না।

"আই অন্‌লি ফিফ্‌থ ক্লাস সাব, হী টেন ক্লাস। আই নো নাথিং হী সে। হাউ টক ?"

সমস্যা কঠিন বটে।

"ছেলে বলে না কি করতে চায় ?"

"কখনও বলে, ড্রাইভারী শিখিয়ে দাও, আমি চাকরি করবো। কখনও বলে ছবি আঁকবো।"

"ছবি আঁকবে ?"

"হী গুড পিকচার মেক, সাব।"

একদিন নিয়ে এল ছেলের আঁকা একগুচ্ছ ছবি। অনেকগুলি

পেন্সিল স্কেচ, কাঁচা-হাত হলেও লাইনের সূক্ষ্মতা আছে, এখানে এক আধটু মৌলিকতার চিহ্নও বর্তমান। বাকীগুলি রংএর নকশা। নানারকম শাড়ির পাড়ের, কার্পেটের ডিজাইন। রং চেনে ছোকরা।

"এসব কখন করে ?"

"হী ডু দিস মেনি টাইম। নো রীড, অন্‌লি দিস।"

"কাজ তো ভালই করে। আর্ট স্কুলে ভরতি ক'রে দাও না কেন ?"

"হোয়াট পিকচার ব্রিং মানি সাব! হী গো টু আর্ট স্কুল, হী মেক সিনেমা স্টার পিকচার। নো গ্রাজুয়েট।"

স্কেচগুলির মধ্যে হঠাৎ একখানার উপর চোখ পড়ল। একটি মেয়ে, ক্ষীণাঙ্গী, মুখখানা রুক্ষ হলেও চিবুকে ও ওষ্ঠাধরে লাবণ্য লেগে রয়েছে। চোখ দুটি ড্যাবডেবে, বাঁ গালে মস্ত এক তিল। সালোয়ার কামিজ পরনে, উড়নি বুকের ওপর নয়, গলায় মোড় খেয়ে পিঠে ঝুলছে।

"এটা কার ছবি ?"

"ডোণ্ট নো সাব। ফ্রম হিজ মাইণ্ড।"

মিথ্যা কথা বলতে পারে না হরনাম সিং। অস্বস্তি বোধ করে। নড়ে চড়ে বসল।

"ওয়ান আর্জি, সাব।"

"বলো।"

"ইউ স্পিক টু মাই বয়।"

"কি বলবো ?"

"হী পেইণ্ট বাট নো রীড। হী বি বি. এ."

"আমি বললেই হবে ?"

"ইয়েস সাব।"

"আচ্ছা বলবো একদিন। নিয়ে এস আমার কাছে।"

"হী নট কাম, সাব। ইউ প্লীজ কাম মাই হোম।"

"আচ্ছা যাবো একদিন।"

যুদ্ধকালে টমীদের সঙ্গে থেকে থেকে হরনাম সিং কয়েকটি বিশেষ শব্দ রপ্ত করেছে। একটা হ'ল, 'ক্যারী অন, জনি'। এটা রাস্তায় চলতে চলতে সে প্রায়ই ব্যবহার করে। অন্য কোনও গাড়িকে রাস্তা দেবার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে, "ক্যারী অন, জনি।" আর একটা হ'ল, কয়েকটি ইংরেজী গানের কলি। যেমন, "আই লাভ ইউ মাই ইংলণ্ড।" 'ইংলণ্ড' শব্দটি সম্ভবত হরনাম সিংএর নিজের সংযোগ। "আই লাভ ইউ মাই লাভ" বলতে সরম হয়। তাই, "ইংলণ্ড"। এ গানটা সে প্রায়ই করে, বিশেষ ক'রে যখন সপরিবার আমরা দূরে কোথাও বেড়াতে যাই। আর একটা গানও মাঝে মধ্যে গেয়ে ওঠে। "হোয়েন দি ফ্লাওয়ার্স ব্লু", কথাটা নিশ্চয় 'ব্লুম', কিন্তু 'ম' অনেকদিন ফুল থেকে ঝরে গেছে, ফুল এখন নীল।

আলোয়ারের রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। গাড়ি চালাতে চালাতে হরনাম সিং বার বার পেছন থেকে হর্ন বাজানো ড্রাইভারদের লক্ষ্য ক'রে চেঁচিয়ে উঠছিল, "ক্যারী অন, জনি।" ছেলেমেয়ের অনুরোধে এক সময় গানও ধরেছিল : "আই লাভ ইউ মাই ইংলণ্ড।"

টুটুল, আমার মেয়ে, প্রশ্ন ক'রে বসল, "হরনাম সিং, তুমি ইংলণ্ডকে ভালোবাসো ?"

"ভেরী মাচ লাভ আই ইংলণ্ড।"

"চলে যাও না কেন ?"

"হাউ গো, পুওর ম্যান।"

বাপী বলল, "অনেক পাঞ্জাবী তো চলে গেছে ও যাচ্ছে।"

"সামটাইম আই অলসো থিংক আই গো।"

"যাও না কেন ?"

"টাইম কাম, আই গো।"

"কবে।"

"হোয়েন বয় পাস বি. এ. আই গো।"

"বৌ আর ছোট ছেলে ?"

"দে গো ভিলেজ।"

"খাবে কি ?"

"আই হ্যাভ ল্যাণ্ড দেয়ার। দে নো হাংগার।"

"গিয়ে কি করবে ?"

"বিগ সাহেব মোটরকার ড্রাইভ। রোল্স্‌রয়েস।"

"ফিরে আসবে না ?"

"নো কাম ব্যাক। আই লাভ সী মেনি কানট্রি। ইয়োরোপ ভেরী গুড। ইণ্ডিয়া ভেরী ব্যাড। ভেরী পুওর। হিয়ার অল চোরস্।"

সেদিন আবার হরনাম সিংকে তাকিয়ে দেখলাম। "আই লাভ সী মেনি কানট্রি।"

মাস খানেক পর, একদিন সন্ধ্যায়, বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ হরনাম সিং বলে বসল : "সাব, বয় এগেন মাচ ট্রাবল্।"

"কি হ'ল আবার ?"

হঠাৎ জবাব দিল না হরনাম সিং। আমারও উৎসাহ ছিল না একটুও।

একটু পরে বলে উঠল, "হী গো আফটার গার্ল।"

চমকে উঠলাম।

"হী গো আফটার গার্ল।"

"বয়স কতো ?"

"উনিশ।"

"তবে ও মেয়েদের পেছনে ঘুরবে নাকি তুমি ঘুরবে ?"

হো হো ক'রে হেসে উঠল হরনাম সিং।

"দেন নো ফিয়ার, সাব ?"

"মেয়েটি কে ?"

পড়শী কারুর মেয়ে।”

“কতো বড়ো।”

“নট স্মল। গ্রো আপ গার্ল।”

“ছেলে কি করে ?”

“গো আফটার শী।”

“বারণ ক’রে দিও।”

“নট হীয়র হোয়াট আই সে।”

“উনিশ বছরের ছেলে, একটু আধটু তো মেয়েদের সঙ্গে মিশবেই। বাড়াবাড়ি কিছু না করলেই হ’ল।”

“নো সাব, নট দ্যাট থিং। বাট গো আউট হী অ্যাণ্ড শী।”

“বন্ধ ক’রে দিও। মেয়ের বাপকে বোলো।”

এর পরে ঘটনা ঘূর্ণিরূপ ধারণ করল। হঠাৎ এমন তেজে ঘুরল, না হরনাম সিং না আমি তার সঙ্গে তাল রাখতে পারলাম।

দিন দশেক পর একদিন হরনাম সিং দপ্তরে এসে হাজির। চোখে মুখে আর্ত ভয়ের চিহ্ন। লোকটা কেমন যেন দিশেহারা মনে হ’ল।

“কি ব্যাপার ?”

“ডেনজার, সাব।”

“কি হয়েছে।”

“লড়কি কাম মাই হোম।”

কেমন যেন মেজাজ গরম হয়ে গেল আমার।

“ইংরেজী রাখো। বুঝিয়ে বলো। লড়কি ? কোন লড়কি ?”

যা বলল তা যেমন নাটকীয়, তেমন সংকট-সংকুল। ছেলেটা অনেকদিন হ’ল সেই পড়শী মেয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে এসেছে। স্কুল যাবার নাম ক’রে দুজনে সারা দিন ঘুরে বেড়িয়েছে। সিনেমায় গেছে। পাড়ার সবাই এ নিয়ে অনেকদিন ধরে নানা রকম বলছে। হরনাম সিং-এর বৌ নালিশ করেছে কিন্তু সে বড় একটা কান দেয় নি। এখন,

আজ, সেই মেয়ে এসে হাজির হয়েছে হরনাম সিংএর বাড়ি। নিজের ঘরে সে যাবে না। ওখানেই থাকবে।

এমন ঘটনা সচরাচর আমাদের সমাজে ঘটে না। হঠাৎ যেন বড় অসম্ভব, বড় গল্পেটে মনে হ'ল।

কিন্তু গল্প তো নয়। একেবারে বাস্তব ও সত্যি।

"হোয়াট ডু সাব ?"

"তোমার ছেলে কি বলে ?"

"হী ব্রিংগ গার্ল হোম—"

"হিন্দীতে বলো।"

বলল, "ছেলে মেয়েটাকে বাড়ি নিয়ে এসেছে। মাকে বলেছে, ও এখানেই থাকবে।"

"মেয়ের বাপ-মা কি বলে ?"

"কিছু না। মেয়ের বাপের সাত সাতটা বাচ্চা। নিজের বাড়িতে থাকতে চায় না মেয়েটা। যেতেও রাজী নয়। তারাও ডাকতে আসে নি।"

"খবর দিয়েছিলে ?"

হরনাম সিং উত্তেজিত হয়ে হিন্দী ছেড়ে ইংরেজী ধরল: "আই গো মাইসেল্‌ফ্‌, সাব। টু গার্লস ফাদার। টেল, টেক ইওর ডটার মাই হোম। হী সাইলেন্ট। নট সে এনিথিং।"

"এখন তুমি কি করবে ?"

"কি করবো সাব তাইতো ভাবছি। আমার জীবনটা এমন সুখের ছিল। সব শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। ছেলেটা সত্যনাশ ক'রে দিল।"

একটু পরেই: "এভরিথিং চেঞ্জ, সাব। হোয়াট ওয়ার্লড! বয় ব্রিং গার্ল হোম। আই স্টে হিয়ার, শী সে। নট গো টু মাই হোম। ও মাই গড, হোয়াট ওয়ার্লড!"

হেসে উঠল হরনাম সিং।

পরের দিন আটটা বাজতে না বাজতে বাড়িতে এসে হাজির।

"কি ব্যাপার ?"

"সাব, গাড়িটা একটু পেতে পারি ?"

এমন আর্জি এর আগে কখনও করে নি।

"গাড়ি ? গাড়ি কেন ?"

"সাব, এভরিবডি সে গিভ দেম ম্যারেজ।"

"বল কি ? বিয়ে দিয়ে দেবে ?"

"হোয়াট ডু সাব ? অল বডি সে গিভ দেম ম্যারেজ।"

"তুমি রাজী হয়ে গেলে ?"

"হোয়াট ডু সাব ? মাচ ট্রাব্‌ল। ভেরী ব্যাড।"

"ছেলে কি বলে ?"

"বয় সে গিভ ম্যারেজ।"

"তোমার বৌ ?"

"ওয়াইফ ভেরী সিম্‌প্‌ল। শী অন্‌লি ক্রাই।"

"তাহলে বিয়েই দিচ্ছ ?"

"হোয়াট ডু সাব ?"

"কবে ?"

"নাউ, সাব। অল গো টু গুরদ্বারা।"

"ছেলের লেখাপড়া কিন্তু উঠল।"

"নো সাব। বয় সে গিভ্‌ ম্যারেজ, আই গো স্কুল, পাস বি. এ. নো ম্যারেজ, আই লীভ হোম।"

"তাই তুমি রাজী হলে ?"

"হোয়াট ডু সাব ?"

একটু পরে : "কার টেক সাব ওয়ান আওয়ার ?"

"না। ট্যাক্সী ক'রে বিয়ে দিতে যাও। গাড়ি দিতে পারব না।"

গুরুদ্বারায় নানক সিংএর বিয়ে হ'ল। হরনাম সিংএর খরচ হ'ল

কুড়ি টাকা। মেয়ের বাপের এক টাকা পঁচিশ পয়সা। গুরুদ্বারার পুরোহিতের দক্ষিণা। হরনাম সিং দশজন আত্মীয় বন্ধুদের ডেকে খাওয়াল। ট্যাক্সীতে খরচ করল আট টাকা। বৌ-এর জন্যে নতুন শাড়ি কিনে আনল। মেয়ের বাপ ব্যয় করল না এক পয়সা। পার্টি দিল না। মেয়েকে একখানা শাড়ি-গয়না পর্যন্ত না। সম্পর্ক রাখল না।

সাতদিন পর হরনাম সিংএর ধর্মপত্নী পুত্রবধূকে নিয়ে হাজির হ'ল করোলবাগের এক লেডী ডাক্তারের কাছে।

এ খবরটা পেলাম মাস খানেক পরে।

হরনাম সিং বলল, "বয় এগেন ডিফিকাল্ট, সাব। নট গো স্কুল।'

"স্কুল এবার ছাড়ো। একটা কাজকর্মে ঢুকিয়ে দাও।"

"হোয়াট ওয়ার্ক হী ডু ?"

"কোনও কারখানায়—"

"আই নট ডু দ্যাট সাব। আই হোপ হী পাস বি. এ.। ইফ নট, হী গো টু হেল।"

"ছেলে বিগড়ে গেল কেন ?"

"ব্যাড লাক, সাব। হী অ্যাণ্ড গার্ল গো আউট অল ডে। কাম ব্যাক ইভিনিং।"

"তোমার ভাড়াটেকে তুলে দিয়েছ ?"

"নট সাব।"

"সবাই এক ঘরে শোও ?"

হরনাম সিং প্রশ্নটা বুঝল। বিষণ্ণ হেসে বলল, "হোয়াট ডু সাব ? আই পুওর ম্যান। হোএয়ার গেট থার্টি রুপী ?"

"কিন্তু—"

"নো, সাব। আই টেল ইউ অল থিং। গার্ল পেগ্‌নেণ্ট। ওয়াইফ টেক হার করোলবাগ ফর ওয়াশ। নো বাচ্চা সো স্যুন। বয় নট রীড।"

তিন সপ্তাহ পরে নানক সিং নববধূকে নিয়ে ঘর ছাড়া হ'ল। ছোট্ট একটি পরচি রেখে গেল বাপের জন্যে : তোমার সঙ্গে আর থাকব না। নিজে কাজ ক'রে খাব। পড়ব না। স্কুলে বলে দিও।"

গল্পটা দিন দশেক আগে শুরু করেছিলাম। এই দশদিনে নতুন এক ঘটনা ঘটেছে। হরনাম সিং আর আমার গাড়ি চালায় না।

হরনাম সিং এখন জেলে।

সহকর্মী ড্রাইভার অনন্ত সিং তার নতুন বি. এ. পাস-করা ছেলেকে নিয়ে এসেছিল দপ্তরে সবাইকে দেখাতে। হঠাৎ হরনাম সিংএর সঙ্গে তার ঝগড়া বেধে গেল।

মাটি থেকে গাড়ি স্টার্ট দেবার ডাণ্ডা তুলে হরনাম সিং তাকে মারতে গিয়েছিল।

অনন্ত সিংএর বদলে 'ডাণ্ডা' পড়েছিল তার ছেলের মাথায়।

হরনাম সিংএর একমাস জেল হয়েছে।

পান্থ প্রেম

যাঁর কথা বলছি, তিনি ভারতবর্ষের নাগরিক ; কর্মজীবনের দীর্ঘকাল বিদেশে কাটছে। বিদেশ মানে তো আজকাল আর বিলেত নয় ; গোটা পৃথিবী। ইনি য়ুরোপের সর্বত্র বাস করেছেন ; বাস করেছেন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ; আফ্রিকা এবং এশিয়ায়। এ শতাব্দীর চার দশকের পর, সভ্যতার চাবুক খেয়ে অপরিমিত একটি আন্তর্জাতিক মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে : এ-গোষ্ঠীর সভ্যদের মাতৃভূমি নিশ্চয় আছে, তার জন্যে তাঁদের মন মাঝে-মধ্যে অবশ্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু মাতৃভূমিতে ক্ষণকাল প্রবাসের সম্ভাবনায় মন যেমন ছলছল করে, স্থায়ী নিবাসের প্রস্তাবনায় তেমনি ওঠে আঁতকে। অর্থাৎ এঁরা কোনও এক দেশের নয় ; বহু দেশের মানুষ। সুদূর ভবিষ্যতে অনেক মানুষের যে-মানস চেহারা আজ কল্পনীয়, এরা তার অগ্রদূত।

যাঁর কথা বলছি, পুরুষ হিসাবে তিনি উত্তম। একদা ভারতবর্ষের অন্যতম মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্তিমান ছাত্র ছিলেন। পরীক্ষায় যেমন শীর্ষস্থানে স্থায়ী অধিকার ক'রে নিয়েছিলেন, স্ফূর্তি, আড্ডা, হুজুগ-হুল্লোড়েরও ছিলেন নেতা। সুদর্শন না হ'লেও দেহে ব্যক্তিত্বের উদ্বৃত্ত প্রভা সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইংরেজীতে যাকে বলে ডাইনামিক পার্সোনালিটি। জীবনকে দুঃসাহসিক পৌরুষে ভোগ করবার ক্ষমতা রাখেন ; মাইনে পান, ভারতবর্ষের মাপে, অনেক। মদ্যপান ক'রে সচরাচর মাতাল হন না ; বান্ধবীদের খুশি করার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকেও সুখী রাখবার দুর্লভ চারুশিল্পে সুদক্ষ ; আনন্দ-আমোদ করবার সময় মানিব্যাগ সম্বন্ধে সতর্ক থাকেন ; প্রয়োজন মতো আমোদ-আহ্লাদ, বন্ধু-বান্ধবী-সৎকারে অকৃপণ হয়েও কর্মজীবনের উদ্বৃত্ত অর্থে দেশে

ইতিমধ্যে দু'খান বাড়ি তৈরি করেছেন; আতঙ্ক-জনক দামের তিনটি প্লট কিনে রেখেছেন। ব্যাংকে বেশ কিছু অর্থ আছে। ধন-সম্পত্তি পদমর্যাদা নিয়ে দম্ভ করেন না; অতি বিনয়ও না।

প্রেমিক বলে পৃথিবীর অনেক দেশে তাঁর সুনাম আছে। এ সুনাম সহজলভ্য নয়। প্রেমে লোভ প্রায় সব পুরুষের; প্রেম করবার সাহস ও ক্ষমতা খুব কম পুরুষের। এর মধ্যে যে-পুরুষ বাঙালি, চীনা, জাপানী, ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী, ডাচ, মার্কিন, মেক্সিকান, আরব এবং তুর্কী রমণীদের সঙ্গে এক জীবনের, এক যৌবনের সীমিত পরিসরে প্রেমের সুমধুর সম্পর্কে গড়ে তুলতে পারেন, প্রাতঃকালে তাঁর নাম স্মরণ করলে মদনানন্দ মোদকের প্রয়োজন হয় না। সব চেয়ে বড় কথা—যাঁর কথা বলছি, তিনি দেহ-সুখের জন্য নারীসঙ্গ খুঁজে বেড়ান না। যে-সব নারী তাঁর জীবনের আকাশ-বিস্তৃত বীথিতে সমাগত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের প্রতি তাঁর মমতা আন্তরিক। নারীকে তিনি জীবন-রহস্যের অপরিসীম আঁধার মনে করেন: পৃথিবীর নানা দেশের মেয়েদের মধ্যে এ রহস্যের বিচিত্র ব্যঞ্জনা। চীনা মেয়ের প্রেম যে আরবী মেয়ের প্রেম থেকে কত আলাদা, বাঙালি কন্যার লাজুক ভালবাসা আর ফরাসী মেয়ের নিপুণ প্রগল্‌ভতার যে কত প্রভেদ, নিউ ইয়র্কের ৫৮নং স্ট্রীটের রেস্তোরাঁয় বা জাতিপুঞ্জের দপ্তরে আলাপ হওয়া তরুণী আর পেরুর রাজধানী লিমায় লেকের ধারে ছোট ভিলায় বাস করা মেয়ে যে কত বিভিন্ন, জীবন-রহস্যের কি নতুন নতুন ব্যঞ্জনা যে এদের এক-এক কুমারী-বুকে সমুদ্রের ঢেউএর মতো উদ্বেলিত—ইনি বলেন—তা যে সৌভাগবান (এবং ক্ষমতাবান) পুরুষের জানবার সুযোগ হয়েছে তার কথা অমৃত সমান, একমাত্র পুণ্যবানদেরই শোনবার সুযোগ মেলে।

"এদের কাউকে আমি ভুলি নি, ভুলতে পারি নি"—নিউ ইয়র্কে একদিন তিনি বলছিলেন। "এদের প্রত্যেকের কাছ থেকে জীবনের

এক টুকরো দিয়ে এসেছি, প্রত্যেকের কাছ থেকে জীবনের এক টুকরো নিয়ে এসেছি।"

"তোমাদের নিয়েই কবিরা কাব্য রচনা করেন,"—আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মন্তব্য করেছিলাম।

"যথা ?"

"এই ধরো :

'ভুলে থাকা সে তো নয় ভোলা,
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর
দিয়েছ যে দোলা।' "

"রবি ঠাকুর তো! জানি—'সঞ্চয়িতা' থেকে বলছ। এখনও আমি সময় পেলে রবি ঠাকুরের কবিতা পড়ি।"

"ধন্য রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু কাব্য থাক। তোমার সঙ্গে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির অনর্থ নিয়ে আলাপ করলে আমার জ্ঞান বাড়বে। কিন্তু সে বড়ো বিস্বাদ।"

"হুইস্কি খাও।"

"তাও তো বিস্বাদ। তার চেয়ে তুমি দু'একটা আন্তর্জাতিক প্রেমের গল্প বলো। শুনতে বেশ লাগবে।"

"ও, কন্‌ফেশন করাতে চাও বুঝি ?"

"তুমি তো পুণ্যবান, তোমার আবার কনফেশন কি ? ও সব আমাদের। লুকিয়ে ভয়ে ভয়ে কোন্ মেয়ের হাত ধরেছিলাম তার কাতর স্বীকারোক্তির জরিমানা দিয়ে মা-কালীর ক্ষমা ভিক্ষা করা।"

"স্থ্‌স্থ্‌। তোমার জন্যে দুঃখ হয়। জানো, জীবনে প্রেমের মতো আর কিছু নেই। ব্রাউনিং-এর লাইনগুলো মনে আছে ?

Oh, heart ! Oh blood that
freezes, blood that burns !

Earth's returns
For whole centuries of
folly, noise and sin !
Shut them in,
With their triumphs and
their glories and the rest.
Love is best."

"ঠিক এর বিপরীত কথাও অনেক কবি বলেছেন।"

"আমি সারা দুনিয়া চরে বেড়াই। পৃথিবীভরা কেবল গোলমাল। লড়াই, সংঘাত, দ্বেষ, হিংসা ঘৃণা, অবজ্ঞা, জুলুম, শোষণ, হত্যা, লাঞ্ছনা, খুন, ধর্ষণ, দরিদ্রের কাতর লোভ, ধনীর দুর্বল দাপট। সব মিথ্যে মনে হয়। আজ যারা যুদ্ধে এক জন অন্য জনের গলা টিপে ধরছে, কাল তারা গলাগলি হয়ে তৃতীয়ের বুকে ছুরি মারছে। এই ধরো না, আমেরিকা আর রাশিয়া। দু'জনেই জানে সহবাস ছাড়া গতি নেই, অথচ মরা ভালো-বাসায় গলিত স্বামী-স্ত্রীর মতো দিনরাত অবিরাম কুৎসিত কোন্দল।"

"কথাটা বেশ বলেছ। ঠাণ্ডা-যুদ্ধের এমন রসিক বর্ণনা আগে শুনি নি।"

"এর মধ্যে একমাত্র খাঁটি হ'ল প্রেম। দুটি মানুষ—বেশি নয়, দুটি মানুষের দুস্তর ব্যবধান অতিক্রম ক'রে একান্ত নিকটে আসা। আমেরিকার সঙ্গে জার্মানীর লড়াইটা আমার কাছে অর্থহীন দেখছ তো, আজ দুয়ে কি রকম মিতালি! কিন্তু যুদ্ধ চালাবার সময়েও আমার এক মার্কিন বন্ধু একটি জার্মান মেয়েকে ভালোবেসেছিল : এটা আমার কাছে গভীর সত্য, পরম সত্য।"

"গল্পটা বলো না, শোনা যাক।"

"গল্প কিছু নেই। এমন গল্প অনেক শুনেছ। গল্প ও জীবনের মধ্যে তফাত অনেক। মানবতা ও মানুষে যেমন তফাত।"

"তা'হলে এমন কিছু বল, যা বেশি শুনি নি।"

"আচ্ছা বলছি ; হয়তো শুনেছ এ ধরনের কাহিনী। হয়তো এর আগে বোঝো নি।"

"কিংবা হয়তো বুঝেছি, শুনি নি।"

বন্ধু সোডাতরল হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলতে লাগলেন : ভারতবর্ষে যখন যাই, একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাই, অথচ ঠিক বুঝতে পারি নে। শুনি আমাদের মেয়েদের মতো ভালোবাসতে কেউ জানে না। তা হয়তো হবে। সব জাতিরই অহংকার আছে ; ভালোবাসার অহংকারটা বরং শোভন। যদিও, সারা পৃথিবীতে বোধ হয় একমাত্র ভারতীয় মেয়েরাই 'তোমায় আমার ভালো লাগে' শুনলেই অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত পুরুষের সঙ্গ ভয়ে ও ঘৃণায় পরিত্যাগ করবে। তুমি বলবে, আমাদের ভালোবাসা নিবিড়, ঘন। সম্পর্ক ঘনিয়ে নিবিড় না হ'লে আমাদের মেয়েরা ভালোবাসে না। আমি মেনে নেব, কেননা ভালোবাসা ঈশ্বরের মতো তর্কের বাইরে। যা মানবো না, তা হচ্ছে আমাদের অন্য দাবি : পশ্চিমের মেয়েরা ভালোবাসতে জানে না, জানে কেবল ভোগ করতে, ঠকাতে। পশ্চিম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রায় ঠিক যতোখানিই মারাত্মক ভুল, আমাদের সম্বন্ধে পশ্চিমের ধারণা ততোখানি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ট্রাজিডি হল : বিজ্ঞানের চাপে তার ভৌগোলিক ব্যবধান দ্রুত কমে আসছে, অথচ মানসিক ব্যবধান যাচ্ছে বেড়ে। অজ্ঞানতার থেকে স্বল্পজ্ঞান যে বেশি মারাত্মক, আজকের আন্তর্জাতিক জীবনে তা প্রমাণিত সত্য।

তোমাকে দুটি পশ্চিমী প্রেমের গল্প বলবো। প্রেমের দুই নমুনা। গল্প বলার আগে ভণিতা করা আধুনিক রচনা-শৈলীতে নিন্দিত। তাই, একেবারেই ভণিতা করবো না।

কর্মযোগে একদা গেছি বন্‌-শহরে, পশ্চিম জার্মেনীর রাজধানী। ছিল ছোট্ট গ্রাম্য-শহর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে, এখন দশ-ধাপ

প্রমোশন পেয়ে একেবারে রাজধানী। আসলে বন্ এখনও গ্রাম্য শহর, সরকারী দপ্তর, পার্লামেন্ট এসব ছাড়া আর কিছু নেই। যেমন আমাদের নিউ দিল্লী ; যতো আধুনিকতম সাজ প্রসাধন লাগাও না, আসলে কন্যা প্রাচিনী, মেদ বহুলা এবং—। বনের পাশে আসল শহর হল কোলন, ডানিউব নদীর ধারে, ভারী সুন্দর শহর।

জাতিপুঞ্জের কর্মচারী আমি, অথচ পশ্চিম বা পুব কোনও জার্মেনীই তখন জাতিপুঞ্জের সভ্য নয়। আমার কাজটা, অতএব, একটু ডেলিকেট। কিছু লোক-জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে, কিন্তু সরকারীভাবে নয়। সুতরাং শরণ নিতে হল এক সাংবাদিক বন্ধুর।

সে বলে লণ্ডন টাইম্স্-এর প্রতিনিধি। নাম নাই বা বললাম, ধরে নাও জন। বন্ শহরে তার যেমন খাতির, তেমন প্রভাব। ইংরেজ, বয়স ছত্রিশ-আটত্রিশ হবে, টাকের জন্যে একটু বেশি দেখায়। লম্বা দোহারা দেহ, রং বেশ তামাটে, ভদ্রলোক দীর্ঘকাল রোমে ছিলেন। তাকে অনুরোধ করলাম, পার্টি দেবার জন্যে। খুশি হয়ে সে কক্‌টেল পার্টি দিল, অনেক গণ্যমান্য লোকেদের নিমন্ত্রণ করল, যাদের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলতে চাই, তাদেরও। স্বামীরা স্ত্রীদের নিয়ে এলেন, কিছু কিছু পুরুষ মেয়ে একাই এল। পার্টি জমে উঠল।

তুমি ভাবছ এ হট্টগোলের মধ্যে আমি গোপনীয় কথা বললাম কি করে। বললাম না। যাদের সঙ্গে আমার কাজ ছিল, তাদের সঙ্গে পরে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলাম মাত্র। বাকী যা হল, তা মদ খাওয়া, গাল-গল্প করা, পৃথিবীর কেচ্ছা কপচানো, ছুনিয়ার সমস্ত সমস্যার সমাধান।

আমার সাংবাদিক বন্ধুর স্ত্রী জার্মান। প্রথমা নন, দ্বিতীয়া। আমাদের সান্ধ্য আসরে অদ্বিতীয়া। প্রথমত তিনি হোস্টেস। দ্বিতীয়ত, কথাবার্তায় অসাধারণ চতুরা। ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী ও ইতালিয়ানে সমান অধিকার। রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন, চিত্রকলা এমন কি শেয়ার

মার্কেট নিয়েও আলাপ করবার ক্ষমতা রাখেন। আমি তো প্রায় মূছা গিয়েছিলাম তিনি যখন বললেন, প্রবোধ সান্যালের গল্প পড়েছেন। চাল মারছিলেন? না হে না, প্রবোধ সান্যালের গল্প সত্যিই জার্মানীতে অনূদিত হয়েছে।

খুব একটা সুন্দরী নন। বয়স ত্রিশ বত্রিশ মনে হ'ল। লম্বায় মাঝারি, বেশ ভালো ফিগার, তদুপরি তার সবটুকু ঐশ্বর্য প্রকাশিত করবার আর্ট জানা আছে। চোখ দুটি নীল আকাশের দু' টুকরো, বেশ বড় বড়। নাক, চিবুক, গালে ভাস্কর্যের দোষ আছে, কিন্তু সব মুখখানায় আলতো লাবণ্য। মুখের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কপাল—অমন বুদ্ধিদীপ্ত, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক ললাট মেয়েদের বেশি দেখা যায় না। অর্থাৎ মহিলার যত-না সৌন্দর্য, তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী। আকর্ষণীয়া। আলাপে এমন পটু যে, সহজে সঙ্গ ত্যাগ করতে ইচ্ছে হয় না।

আমার বন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বছর পর দেখা—বন্ধুত্ব হয়েছিল রোমে। তখন তাঁর প্রথমা স্ত্রীর রাজত্ব ছিল। সাদামাটা ইংরেজ রমণী, নাম ছিল জেন। বিয়ে ভেঙে যাবার পর বছর দুই হ'ল বন্ধু এঁকে পত্নী করেছেন। এঁর নাম আমার জানা নেই। তবে বন্ধুর স্ত্রী তো?—'মিসেস—' বললেই কাজ চলে।

ককটেল পার্টি ঘণ্টা দুই চলল। অনেকের সঙ্গে কথা বলতে হ'ল, অনেক কথা, অনেক বিষয়ে; কিন্তু মহিলাটির সঙ্গেও কথাবার্তা কম হ'ল না। তিনি বার বার বললেন ভারতবর্ষকে তাঁর খুব ভালো লাগে, একদিন-না একদিন ভারতে তিনি যাবেনই। ভারতীয়দের প্রতি তাঁর একটু স্বাভাবিক দুর্বলতা। আজকের নয়। বহুদিনের। পার্টি শেষ হ'ল। একে একে সবাই বিদায় নিল।

বন্ধু বললেন, "আমি আজই রাত্রে বার্লিন যাচ্ছি। এক্ষুনি আমায় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। আমার স্ত্রী তোমায় হোটেলে পৌঁছে দেবেন।"

বললাম, "বেশ তো। তুমি ফিরছ কবে?"

"কাল।"

"আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ো। কথাবার্তা হবে।"

বন্ধুপত্নী গাড়ি ক'রে হোটেলে নিয়ে এলেন। রাস্তায় জার্মেনী সম্বন্ধে কথাবার্তা হ'ল। আমার শুনে ভালো লাগল, যখন ইনি বললেন, দেশ ভাগকে আমাদের একদিন না একদিন মেনে নিতেই হবে। পূর্ব জার্মেনী থেকে রাশিয়া কখনও সরবে না, যতোদিন জার্মান জাতকে নিয়ে তার ভয় থাকবে। দেখতে পেলাম, বার্লিন বা দ্বি-খণ্ডিত জার্মেনী নিয়ে মেয়েটি অন্য অনেকের মতো ভয়ানক উত্তেজিত নয়। পূর্ব জার্মেনী সম্বন্ধে দু-একটা মৃদু প্রশংসাও করলেন।

হোটেলে এলে ভদ্রতা ক'রেই বললাম, "আমার ঘরে আসবেন? যদি অন্য কিছু কাজ না থাকে, তা'হলে একটু পান করতে পারেন।"

"আপনার কোনও কাজ নেই?"

"আজ রাত্রে না।"

তিনি ঘরে এলেন।

বিদায় নিলেন সকালবেলা। স্বামী দশটায় বার্লিন থেকে ফিরবে। আটটার মধ্যে গৃহে যাবার জন্যে অস্থির হলেন।

যাবার আগে নিজের হাতে কফি বানিয়ে পান করলেন, জামা-কাপড় পরে বিদায় নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, 'থ্যাংক ইউ।'

দরজা অবধি গিয়ে, দরজা খুলে, একবার দাঁড়ালেন। আমি খবরের কাগজটা তোলবার জন্যে আনত হয়েছি।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার গালে হাত রাখলেন।

বললেন: 'তোমার সঙ্গে একরাত্রের বন্ধুত্ব হ'ল। যা দিলে তার জন্যে ধন্যবাদ। কিছু (একটু থেমে, একটু হেসে) আমার নামটি পর্যন্ত জিজ্ঞেস করো নি। এখন জানতে চাও?"

একে ভারতীয়, তার ওপর বঙ্গসন্তান। রবিঠাকুরের কবিতা জিভের ডগায় এসে গেল। সামলে নিলাম।

শুধু বললাম, খুব আস্তে, খুব নরম সুরে, 'না।'

তুমি শক্‌ড্‌? না কি তোমার ভীষণ হিংসে হচ্ছে? এ কোনও প্রেমই নয়? ব্যাভিচার? যার নাম পর্যন্ত জানো না সে এসে অবলীলাক্রমে তোমার সঙ্গে একটা রাত কাটিয়ে গেল? নিজের স্বামী থাকা সত্ত্বেও? এজন্যেই তো পশ্চিমের সমাজ রসাতলে যাচ্ছে। এর মধ্যে প্রেমের নামগন্ধ নেই! কেবল দেহ-ভোগ—ক্ষণিক লালসার অবাধ পরিতৃপ্তি?

তর্ক করবো না। প্রেম ঈশ্বরের মতো : তর্কে বহুদূর। শুধু বলবো, বুঝতে শেখ। এ ধরনের ঘটনা ভারতবর্ষে—বাংলাদেশে—অহরহ ঘটছে। ঘটছে পৃথিবীর সবদেশে। কিন্তু বন্‌-এ সেই এক রাত্রির অন্তরঙ্গতায় কোনও নোংরামি ছিল না। কোনও দাবি নয়, দাওয়া নয়, রাগ-অভিমান, জাতিভেদ, দ্বেষ-বিদ্বেষ—কিছু নয়। সামাজিক নীতির মাপকাঠিতে এ সম্পর্ক দেখলে এর মধ্যেকার কাব্যিক সৌন্দর্যটুকু তুমি খুঁজে পাবে না। আমার কাছে সে-রজনীর স্মৃতি মূল্যহীন নয়। মহিলার নাম পর্যন্ত আমি জানতে চাই নি, কারণ জানবার দরকার ছিল না। এ এক অভিনব ভালোবাসা, যার অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, বর্তমান পর্যন্ত নেই। এক রজনীর দায়িত্বহীন অন্ধকারে দুই ক্ষুধার্ত দেহের আদিম সংঘাত ব'লে ভাবলে তুমি এর অসম্মান করবে। কারণ, দেহের দাবি ঘটাবার অনেক সহজ সুগম পথ আছে, ব্যবস্থা আছে। সে রাত্রির পুরো কাহিনী তোমায় বলি নি, কাউকে বলবো না; তা আমার নিজস্ব সম্পদ। নামহীন সে মেয়েটি ও আমি: আমরা এক বিরাট পৃথিবীর দুই মানুষ, আমাদের মধ্যে ব্যবধানের অন্ত নেই। সে ব্যবধান সেদিন ঘুচে গিয়েছিল। অপরিচয়, অজ্ঞানতা, সভ্যতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, কোনও কিছু অন্তরায় হ'তে পারে নি।

তুমি যাই বলো, এ ঘটনার সৌন্দর্য এখনও আমাকে কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল ক'রে রাখে।

আমাদের, সব মনুষ্য-সমাজেই, জীবন বড় উল্টো-পাল্টা নিয়মে গড়া। লজিক নেই। পশ্চিমেই ধরো না কেন। এখানে বদ্ধ ঘরে সিগারেটের ধোঁওয়া আর সুরার গন্ধে দম-আটকানো পরিবেশে, সুবেশ এক দল নরনারীর সামনে তরুণীরা নগ্ন দেহ দেখিয়ে আনন্দ দেয়, পয়সা রোজগার করে। তাতে সমাজের আপত্তি নেই। কিন্তু একটি তরুণী যদি অনাবৃত বক্ষে রাস্তায় চলে বেড়ায়, পুরুষ-মেয়ে সবাই চীৎকার ক'রে উঠবে, পুলিশ এসে তাকে নিয়ে জেলে পুরবে। অর্থাৎ পয়সা দিয়ে, পয়সার জন্যে, নগ্নতায় অন্যায় নেই, স্বাভাবিক স্বাধীন নগ্নতায় যত অন্যায়। আমাদের দেশের কথা আর কি বলবো ; এমন ছুটো জিনিস কমই আছে যা পরস্পরবিরোধী নয়। আমাদের সিনেমায় নায়ক-নায়িকা ঘনিষ্ঠতম হয়ে চুমু খায় না, নায়িকা তখন গান গেয়ে ওঠে। বড়ঘরের মেধাবী ছেলে বিয়ের আগে প্রেম করে, বিয়ের সময় হয়ে দাঁড়ায় বাবার সুবাধ্য সন্তান: মোটা টাকা পণ, গাড়ি, রেফ্রিজারেটর, রেডিয়োগ্রাম দাবির পেছনে তখন তার অনুগত সমর্থন। আজ শুনলে আঁতকে উঠবে, হয়তো বা আমায় মেরেই বসবে: কিন্তু যতোদিন আমাদের ছেলেমেয়েরা সেক্স ও ম্যারেজ এই ছুটোকে আলাদা ক'রে না দেখতে শিখবে, ততদিন তাদের জীবন বিকশিত হবে না। তার মানে এই নয়—বিয়ের দাম নেই ; দাম আছে, খুবই আছে ; কিন্তু বিয়ের বাইরে সেক্সও চিরদিন আছে। আমরা তাকে লুকিয়ে রেখে নোংরা করি। স্বীকার না করে তার বিকার বাড়িয়ে দি।

পশ্চিমে দেখবে ছেলেমেয়েরা বন্ধুত্ব করছে, অবাধে মিশছে। ধরো জেন আর জন বন্ধু। তাদের সম্পর্ক ভালোবাসার—মনের ও দেহের। কিন্তু জেন বলছে, জনকে আমি বিয়ে করবো না। কেন? জন

ইহুদি, আমি ক্রিশ্চান। অথবা, জনকে বন্ধু হিসেবে ভালোবাসি, স্বামীত্বে বরণ করতে পারবো না। যদি এমনি চলে, একদিন ওদের বন্ধুত্বের তাপ কমে আসবে ; জেন সময়মতো এমন পুরুষের সন্ধান পাবে, যাকে বন্ধুত্ব থেকে স্বামীত্বে প্রমোশন দেওয়া চলে। দেহ নিয়ে হিন্দুর যেমন কড়াকড়ি, প্রাচ্যেরও অনেক দেশে তা নেই—ধরো জাপান, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া। তুমি তো জানোই প্রাচীন হিন্দু সমাজেও ছিল না। মহাভারতে নরনারীর সম্পর্কের যে উদার চিত্র দেখতে পাই, তাতে আমার ধারণা বদ্ধমূল যে, মুসলমান শাসনে হাজার বছর না কাটাতে হলে ভারতবর্ষের সামাজিক নীতিরীতি একেবারে অন্যরকম দাঁড়াতো। ইতিহাসের 'যদি'-গুলি চিরদিনই রহস্যময়। তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ টানা যায় না।

ও, তুমি দ্বিতীয় গল্পটা শুনতে চাইছো ? ভেবেছিলাম, বলবো না। বলি নি কাউকে আজ পর্যন্ত। ভেবেছিলাম, নীতি সম্বন্ধে তোমাকে শকিং-শকিং কতোগুলি কথা বলে উত্তেজিত ক'রে দেব। অন্য গল্পের কথা তুমি ভুলে যাবে। দেখছি, তুমি শক্ত বাদাম। কথা দিয়েছি, কথা রাখবো। বলবো সেই না-বলা-কাহিনী। অমৃত সমান কাহিনী, পুণ্যবান হয়ে শুনো।

সে অনেক কাল আগের কথা। কতো কাল তার হিসেব নেই। কালান্তর মানুষ বোঝে কেমন করে ?—চলতি ইতিহাসের দুরন্ত ঘটনা-প্রবাহে ? দেওয়াল পঞ্জিকার বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাওয়া দিন-মাস বছরের মাপকাঠিতে ! কিন্তু এমন ঘটনা আমাদের অনেকের জীবনে ঘটে থাকে, যার ইতিহাস নেই, যা কদাচ অতীত হয় না, যা সর্বদা বর্তমানের চলন্ত চিত্রপটে ছায়া ফেলে। মানুষের জীবনকে যদি নদী প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করো, তা'হলে এ ঘটনাগুলোকে বলতে পারো 'জোয়ার'। জীবন নদী উদ্বেলিত হয়, উছলে ওঠে জোয়ারের সঞ্জীবনী সংযোগে।

তখন আমি প্রথমবার আমেরিকায় এসেছি। পড়তে। এদেশের এক ফাউণ্ডেশন আমাকে বৃত্তি দিয়েছিল, তোমার নিশ্চয় মনে আছে। কর্নেল য়ুনিভারসিটিতে ভর্তি হয়েছি। কর্নেলে গেছ? অমন সুন্দর শহর আর বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকায় বেশি নেই। দেখে থাকবে এদেশের নদীগুলো সত্যিকারের নদী, য়ুরোপের মতো ফাঁকি নয়। তোমাকে পুব-বাংলার পদ্মা, মেঘনা, শীতলক্ষার কথা মনে করিয়ে দেবে। কর্নেল শহর এমনি একটি বড়ো নদীর ওপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস যেমন আয়তনে বিরাট, তেমনি মনোরম। বাড়িগুলি অহংকারে আকাশ ভেদ ক'রে উঁচিয়ে ওঠে নি: গাছপালায়, সবুজ ঘাসে, নানা-বর্ণের ফুলে ক্যাম্পাসকে এঁরা অতি যত্নে সাজিয়ে রেখেছে। আমি তখন নতুন এসেছি, পড়াশোনা নিয়েই সময় কাটাই। অন্য কিছু করার একটা বিশেষ অসুবিধা ছিল। বছর খানেক আগে গাড়ি চালাবার সময় আমার বড়ো রকমের অ্যাকসিডেন্ট হয়। কোমরে বেশ চোট লেগেছিল। প্রায় সেরে এসেছিল, কিন্তু ব্যথা তখনও হত মাঝে মাঝে। খুব একটা চলাফেরা করা বারণ ছিল। এ কারণেই আমি এদের দেশের নাচ শিখতে পারি নি। নাচতে না জানলে এ দেশে উঠোন সত্যিই বাঁকা হয়ে থাকে—বিশেষ ক'রে ছাত্র সমাজে। সহজে ভাল ক'রে মিশে যেতে হ'লে নৃত্য করতে পারা চাই। জীবনটা যদি নেচেই না দেখলে, তবে তার বেঁচে লাভ কি? কি বললে? না নাচলেও বেঁচে থাকা যায়? আমরা তো নাচি নে, ভাগ্য আমাদের নাচায়। আমরা যে ভারতবাসী।

নাচতে না পারলেও, বেশি হৈ-হুল্লোড় না করলেও, ক্যাম্পাসে আমি একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল ছিলাম না। ছাত্র হিসেবে সহজে অধ্যাপকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম। কথাবার্তা তো খারাপ কই নে, আসর বেশ জমাতে পারতাম। লাজুক ছিলাম না কোনও দিন: মানুষ না হ'লে আমার কোনও দিন চলে না। The need of

a world of men for me. ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে, অতএব, আমি বেশ পপুলার ছিলাম। কিন্তু আমাদের ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সত্যিকারের হিরো ছিল কেরলের সোমশংকরন্ পিল্লে। বড়োলোকের ছেলে, দু'হাতে টাকা খরচ করত। চেহারাখানাও বেশ ছিল: কেরলের নতুন ফল দেওয়া নারকেল গাছের মতো। পিল্লের বান্ধবী হাতে গোনা যেত না। সে ছিল ভারতবর্ষের সবচেয়ে সফল অ্যামবাসাডর এদেশে। পণ্ডিত নেহেরু যদি আসফ্ আলির বদলে সোমশংকরন্ পিল্লেকে আমেরিকায় স্বাধীন ভারতের প্রথম রাজদূত ক'রে পাঠাতেন, হ্যারি ট্রুম্যানের সঙ্গে আমাদের জানা-চেনা এমন দরিদ্র হ'তে পারতো না।

এখানে নিজের কথা আর একটু বলে নি। দেশে ছাত্রজীবনে মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিতাম ব'লে তোমরা আমকে ডন জুয়ান বলতে। আসলে আমি ছিলাম আর দশজন তোমাদের মতোই, ভীরু, লাজুক, পিউরিটান। না হয়ে উপায় কি? নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, বাপ যার সারাজীবন গ্রামের স্কুলে হেড মাস্টার, তার কি অন্য কিছু হবার জো আছে? একে তো সুনীতি নামক বস্তুটি মধ্যবিত্ত সমাজের প্রায় একচেটিয়া রক্ষাকবচ—ওপরের তলার নিচের তলার সমাজ সুনীতি মেনে চলে না। তার উপর বাবা যদি গ্রামের স্কুলের হেড মাস্টার হয়, তা'হলে অবস্থাটা এবার অনুমান করতে পারো। তোমাকে আজ সংগোপনে বলে ফেলি, কলকাতায় ছাত্র-জীবনে বান্ধবীদের সঙ্গে বাষ্পাচ্ছন্ন মন দেওয়া-নেওয়া ছাড়া আমার 'ফ্লার্তবাজ' চরিত্রে আর কোনও কলঙ্ক লাগে নি। অর্থাৎ মার্কিন দেশে যখন এলাম, তখনও আমি অক্ষত-যৌবন। দেহ পরিপূর্ণ কুমার। মনেও নখের আঁচড়ের চেয়ে বড়ো কিছু ক্ষত নেই। মেয়েদের সঙ্গে মিশতাম; বাইরে যতোই না ডোণ্ট কেয়ার, ভেতরে ভেতরে শ্বেতকায়া ম্লেচ্ছ রমণীদের নিয়ে বিস্তর ভয়! ক্যাথরিন মেয়ো লিখেছিল ভারতবর্ষের মেয়েরা বিদেশীদের

ছাগল বানিয়ে রাখার জাহু জানে। ভুল। তারা ছাগল ক'রে রাখে নিজেদের স্বামী-পুত্রদের। আর ভারতীয় পুরুষ পুঙ্গবদের ছাগল হবার ভয় পশ্চিমে। অন্তত আমার সে ভয় ছিল ষোল আনা।

সোমশংকরন্ পিল্লে এক বিরাট ব্যাপার ক'রে বসল। আন্তর্জাতিক নৃত্য উৎসব। কর্নেলে, দেখা গেল, আঠারটি দেশের ছেলেমেয়েরা পড়ছে! এ সব দেশের নাচ পরিবেশন হবে। মাস ছুই ধরে ক্যাম্পাসে বিরাট উৎসাহ। পিল্লে তখনও তার তুড়ুক তাস বার করে নি। উদ্যোগ পর্বের শেষ দিনে, মাতাল করতালির মধ্যে সে ঘোষণা করল, নিউ ইয়র্ক থেকে একটি ফরাসী ব্যালেরিনা আসছেন, নৃত্য উৎসবের মর্যাদা ও জৌলুস বাড়াতে।

ব্যালেরিনার নাম লুসিল। পিল্লে অবশ্য একটু বেশি ঢাক পিটিয়েছিল। লুসিল এমন কিছু নামকরা ব্যালেরিনা নয়। পুরো ফরাসীও নয়। সে কথা পরে হবে।

উৎসবের আগের দিন লুসিলের আসবার কথা। সোমশংকরন্ পিল্লের ইয়া-বড় গাড়ি ছিল, ছুটি ভারতীয় মেয়ে ও একটি আমেরিকান ছেলেকে সঙ্গে ক'রে পিল্লে গেল স্টেশনে লুসিলকে আনতে।

সন্ধ্যাবেলা নাচ ঘরে দারুণ ব্যাপার। শেষ রিহার্সাল। অনেকের সঙ্গে আমিও বসে। এক কোণে, জনতা থেকে একটু স'রে।

মন আমার সেদিন আষাঢ়ের বর্ষাদিনের চেয়েও নিরানন্দ। চোখের সামনে ছেলেমেয়েরা সব নাচছে, গাইছে, হৈ হৈ ক'রে দৌড়চ্ছে। হাসির ঝরণা বইছে, দার্জিলিং এর ঝরণাগুলির চেয়েও সুন্দর। আমার কোমরে চিন চিন ব্যথা। ব্যথা না থাকলেই বা কি! নাচতে তো জানিনে। আনন্দের এতো বড়ো হাট বসেছে, আমি না ক্রেতা, বিক্রেতা। চুপ ক'রে বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকা ছাড়া আমার গতি নেই। এক-একজন ভদ্রতা ক'রে কথা বলতে দাঁড়াচ্ছে আমার সামনে, তাতে আমার বিষাদ আর ক্ষোভ বেড়ে যাচ্ছে। ভাবছি উঠে পড়ি, ঘরে চলে

যাই, কিন্তু তার জন্যে যতোটুকু মনের জোর দরকার, তাও নেই। সমস্ত দেহ-মন জুড়ে প্রচণ্ড অবসাদ।

এমন সময় সোমশংকরন্‌ পিল্লে লুসিলকে নিয়ে হলে ঢুকল। অনেকে দেখল তাকিয়ে। অনেকের সঙ্গে আমিও।

আমি দেখলাম। এমন দেখা জীবনে আর দেখি নি। এমন দেখা দেখেই বুঝি রবিঠাকুর লিখেছিলেন ঃ 'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।'

বড় বিস্ময় লাগল। সত্যি, অবাক হলাম। এমন সৌন্দর্যও কি পৃথিবীতে আছে? লুসিলকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হল। মনে পড়ল। বতিচেলির অন্যতম বিখ্যাত ছবিতে 'নগ্ন সত্যে'র রূপ দিতে যে মেয়েটির মূর্তি আঁকা হয়েছে, লুসিল যেন সেই। তেমনি লম্বা, তেমনি কৃশাঙ্গী, তেমনি তেজস্বী, কোমল দীপ্তি। স্বর্ণাভ চুল পর্যন্ত তেমনি গুচ্ছ গুচ্ছ ফেনায়িত কাঁধ বেয়ে পিঠের অর্ধেক পর্যন্ত। লম্বা ধরনের মুখখানা, দুটি টানা গালে ঈষৎ মাংসাভাব, অনেকটা তোমাদের আভা গার্ডনারের মতো। চিবুকটি আলতো ভাবে গড়া। ওষ্ঠাধর দেখলে শেক্সপীয়রের ভাষায় বলতে হয়, এক বৃন্তে দুটি রক্তিম গোলাপ। টানা টানা গভীর নীল চোখ। পশ্চিমে মেয়েদের চুলের আজকাল দেখছই তো কি অবস্থা—তবু আমেরিকার অনেক অঞ্চলে দেখবে মেয়েরা চুল রাখে, অন্তত বব করে; য়ুরোপে তো পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চুল ছাঁটবার জের চলছে। লুসিলের চুল দেখেও আমি মুগ্ধ হলাম। বতিচেলি গ্রীস আর্টের সঙ্গে রোমের কমনীয়তা জুড়েছিলেন ঃ লুসিল গ্রীক, ফরাসী ও মার্কিন সৌন্দর্যে, মনে হল, এক সঙ্গে গড়া।

হঠাৎ আমাকে এক গাঢ় ক্লান্ত বিষণ্ণতা গ্রাস ক'রে ফেললো। মনে হ'ল আমার চারিদিকে যেন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, ব্যাপক ব্যর্থতা। এ তীব্র বিষাদ চরম ঘনীভূত হ'ল যখন, কিছুক্ষণ পরে, রিহার্সাল শেষ হলে, ছেলেমেয়েরা নাচতে শুরু করল। আমি যে জীবনের আনন্দ থেকে কি নির্দয়ভাবে বঞ্চিত এর আগে এমন কঠিনভাবে তা বুঝতে

পারি নি। মনের মধ্যে কারা যেন শত ধিক্কারে বলতে লাগল—সরে পড়, সরে পড়, নির্লজ্জের মতো এখানে বসে থেকো না। অথচ পা আমার অবশ, দেহ অবসন্ন, মন বিষাদের ভারে অতিশয় ক্লান্ত।

তাই লুসিলকে অবিশ্বাস্য চোখে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখেও পালাতে পারলাম না। লুসিল এক পা এক পা এগিয়ে এল, আর আমি ভারত-সন্তান পাথর হয়ে গেলাম। মনের মধ্যে কে বলে উঠলো, এবার তোমার চরম অপমান। লুসিল এসে বলবে, এসো নাচি। তুমি ব্যথায় কঁকিয়ে জবাব দেবে, নাচতে তো জানি নে। লুসিল অগোপন অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চন ক'রে সরে যাবে।

শুনেছি, অজগর যখন হরিণ শিশুর দিকে তাকায়, হরিণ শিশুর পালাবার পথ থাকে না, সে হয়ে যায় পাথরের মতো নিশ্চল। লুসিল অজগর নয়, জাগরী উর্বশী। তবু আমি পাথরের মতো নিশ্চল। সম্পূর্ণ অন্য অর্থে তখন আমারও, পাথরের পর্বতেরও, শরতের হাল্কা মেঘ হবার দুর্বার ইচ্ছে : কিন্তু লুসিল একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল ; তার টানা টানা নীল চোখে লাজুক হাসি, ওষ্ঠাধরে ব্রীড়াময় প্রশ্ন।

'তুমি ভারতীয় ?'

বলতে ইচ্ছে হ'ল না, আমি কেউ নই। কিন্তু বলতে হ'ল, 'হ্যাঁ। আমার নাম মনোজ। মনোজ বাসু।'

'মনোজ' লুসিল চেখে চেখে নাম উচ্চারণ করল। 'আমি লুসিল।'

'জানি।'

'তুমি একা একা এক কোণে বসে আছ কেন ?'

'এমনি।'

'নাচতে জানো না ?'

'না।'

'তাতে কি হয়েছে ? তোমাদের দেশে তো সবাকার নাচ শিখতে হয় না। তোমরা নাচ না, নাচ দেখ। ঠিক বলছি !'

'ঠিক বলছো।'

'আমি তোমাদের ভারতনাট্যম দেখেছি। খুব সুন্দর নাচ। আশ্চর্য সুন্দর।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'তোমার ব্যালে দেখতে ভালো লাগে?'

'একবার মাত্র দেখেছি। বুঝতে পারি নে ব'লে খুব ভালো লাগে নি।'

'মানুষে মানুষে প্রভেদ দেখো কতোখানি? নাচ গান তো মানুষের পরম সৌন্দর্য ও আনন্দবোধের চারু সৃষ্টি। তোমাদের গানে তোমরা যেমন মুগ্ধ, আমাদের সংগীতে তেমনি আমরা। তোমাদের নাচ দেখে তোমাদের দেহ মন-প্রাণ নেচে ওঠে, আমাদের নাচ দেখে আমাদের। তবু আমরা তোমাদের সংগীত নৃত্যের রস পাই নে, তোমরা পাও না আমাদের।'

'যাঁরা দুয়ের মিল খুঁজে পান, তাঁদের বেলা এ কথা খাটে না।'

'ঠিক বলেছো। আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরই দুর্ভাগ্য।'

'তুমি তো কাল নাচবে। আমার দেখে নিশ্চয় ভালো লাগবে।'

'না দেখেই বলছো?'

'তোমাকে তো দেখছি!"

দেখতে পেলাম লুসিল আমার সব অন্ধকার কেটে দিয়েছে। বিষাদের মেঘ গেছে উড়ে। আকাশ আমার নির্মল, উজ্জ্বল।

লুসিল বসেছে পাশের চেয়ারে। তার দেহের সৌন্দর্য আলোকিত করেছে আমাকে। লুসিল কথা বলছে, আমি কথা বলছি। দুই গ্রহ যেন নব-পরিচয়ের নেশায় মেতে উঠেছে।

লুসিল বলল, 'আমি অনেকক্ষণ তোমাকে লক্ষ্য করছিলাম! তুমি কোথায় থাক?'

'ডরমিটরিতে। স্টিফান হল।'

‘কোথায় সেটা।’

‘নদীর ধারে।’

‘কেন্ট হল থেকে দূরে না কাছে ?’

‘কাছেই।’

‘খুব ভালো। আমি থাকবো কেন্ট হলে।’

‘তুমি তো নিউ ইয়র্কে থাকো !’

‘হ্যা। তুমি যাও নিউ ইয়র্কে ?’

“একবার মাত্র গিয়েছিলাম। দুদিনের জন্যে।’

‘আবার যাবে ?’

‘যাবো নিশ্চয়। এদেশে আছি আর নিউ ইয়র্কে যাবো না ?’

‘আমি ব্যালে নাচ শিখছি। আমার মা ব্রডওয়েতে নাচেন। আমিও মাঝে মধ্যে নাচি।’

‘দু’জনে একসঙ্গে থাকো নিশ্চয় ?’

“না, না। মা থাকেন আলাদা। আমার নিজের অ্যাপার্টমেন্ট আছে। মার সঙ্গে কি থাকা যায় ?’

‘আমরা থাকি।’

‘আমরা থাকি না। আমাদের প্রাইভেসি না হ’লে জীবন অচল। অবশ্যি মাকে আমি ভালোবাসি। মা-ও আমাকে খুব ভালোবাসে। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান।’

‘তোমার বাবা ?’

‘প্যারিসে থাকেন। ডিভোর্স হয়ে গেছে অনেক দিন। বাবা আমার ফরাসী। মা আমেরিকান। আমি বাবাকে বড় হয়ে দেখি নি। তিনি আবার বিয়ে করেছেন। মা করেন নি।’

‘তোমাকে দেখে বেশ একটু ফরাসী মনে হয়।’

“তোমার কথা বলো।”

‘বাবা স্কুলের হেড-মাস্টার। গ্রামের হাই স্কুল। মা বাংলা জানেন,

ইংরাজি জানেন না। আমি ছাড়া তাঁদের আরও পাঁচটি সন্তান। অর্থাৎ আমরা দু'ভাই, চার বোন। আমি সবাকার বড়। কলকাতার নাম শুনেছ? ওখান থেকে এম. এ. পাস ক'রে ডক্টরেট করতে এসেছি।'

'বিয়ে করেছ?'

'না।'

'তোমাদের দেশে তো খুব ছোট বয়সে বিয়ে হয়।'

'এককালে হতো। অনেক আগে। এখন হয় না। এখন তোমাদের দেশেই বাল-বিবাহ।'

সোমশংকরন্ পিল্লের বোধ হয় অসহ্য লাগছিল। এগিয়ে এসে বলল, "লুসিল, মাপ করো, তোমাদের বাক্যালাপে বাধা দিচ্ছি। তোমার এখন যাবার সময় হয়েছে। গাড়ি তৈরী।"

লুসিল ঘড়িতে সময় দেখলো।

'তাই তো! এবার যেতে হয়। তুমি চলো আমাদের সঙ্গে।'

পিল্লের মুখে, না তাকিয়েও দেখতে পেলাম, গাঢ় অন্ধকার। বেচারার প্রতি অমন অন্যায় করা উচিত মনে হ'ল না।

বললাম, 'না। তুমি ওদের সঙ্গে যাও। আমার একটু কাজ আছে।'

লুসিল বলল, 'তা'হলে এসো আমায় গাড়িতে তুলে দেবে।'

সোমশংকরন্‌কে বলল, 'এক মিনিট মাপ করো, ভাই। এক্ষুনি আসছি।'

লুসিল গেল 'মহিলা' ঘরে। আমি পিল্লেকে বললাম, 'খুশি হয়েছ তো?'

পিল্লে জবাব দিল, 'ধন্যবাদ।'

লুসিল চটপট বেরিয়ে এল। আমরা গাড়ি পর্যন্ত গেলাম। গাড়িতে বসবার আগে এক টুকরো কাগজ লুসিল আমার হাতে গুঁজে দিল।

কাগজের টুকরো খুলে পড়লাম: বারোটার সময় কেন্ট হলে ফোন কোরো।

রাত তখন দশটা। দু'ঘণ্টা সময় যে এত দীর্ঘ হতে পারে, তা কি আমি জানতাম? কিন্তু সে দীর্ঘ সময়ও কাটল। বারোটা বাজতেই আমি ফোন করলাম।

'ম-নো-জ?'

'হ্যাঁ।'

'কি করছো?'

'কিছু না।'

'চলে এসো।'

'কোথায়?' (বুকে আমার ভূমিকম্প।)

'এখানে, কেন্ট হলে।'

'এখন? এতো রাত্রে?'

'রাত কোথায়? মাত্র বারোটা। চলে এসো।'

'চলে আসবো?'

'আসবে না? আসবে না?'

'আসছি।'

'আমি একতলায় ডান দিকের ঘরে।'

'আচ্ছা।'

আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। নদীর ধার দিয়ে নির্জন রাস্তা। মাঝে মাঝে তরুণ-তরুণীরা ভালোবাসছে। আমার পায়ের শব্দ যেন আকাশ কাঁপিয়ে তুলল। না কি আমার বুকের কাঁপন প্রতিধ্বনিত হ'ল আকাশে? প্রথম শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায়ও আমার দেহের উত্তাপ ঘুচল না। কেন্ট হলে যখন পৌঁছলাম, তখন ঘেমে গেছি।

একতলার ডান দিকের ঘরে মৃদু আলো জ্বলছে। আস্তে টোকা

দিতে দরজা খুলে গেল। মৃদু নীল আলোয় লুসিলকে আমি দেখবার অবকাশ পেলাম না। ঘরে ঢুকতেই দু'খানা নরম সুরভি বাহু আমায় আলিঙ্গনে বাঁধল। চুম্বন বর্ষিত হ'ল আমার চোখে, মুখে, ওষ্ঠাধরে।

'ম-নো-জ।'

আমি অক্ষত যৌবন ভারতসন্তান কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেলাম।

লুসিল বলল, 'তুমি অবাক হচ্চ?'

'একটু হচ্চি।'

'আমি তোমায় ভালোবাসি।'

'সে কি?'

'প্রথম দৃষ্টির ভালোবাসা। জীবনে দুর্লভ। বড় দুর্লভ। এমন আমার আর কখনও হয় নি। হয়তো আর কখনও হবে না।'

'তুমি বুঝি অনেকবার ভালোবেসেছ?'

'কিন্তু এমন কখনও হয় নি।' তোমাকে দেখে মনে হ'ল, তুমি অনেক কালের চেনা, তোমাকে যেন অনেক কাল ধরে ভালোবেসে এসেছি। তোমাকে দেখে মনে হ'ল, তুমি ছাড়া আমার এক মুহূর্ত চলবে না।'

'লুসিল, তুমি বড় সুন্দর। নারী যে এত সুন্দর হ'তে পারে আগে জানতাম না।'

'তুমিও খুব সুন্দর।'

'আমি!'

'হ্যাঁ, তুমি। তোমার রং হালকা মেঘের মতো। তোমার চোখ রাত্রির মতো কালো। তোমার মুখে পবিত্র কৌমার্য। তুমি সুন্দর!'

'তোমাকে দেখেই আমার কি মনে হয়েছিল জানো? আমাদের কবি টাগোর লিখেছিলেন, বড় বিস্ময় লাগে, হেরি তোমারে। তার মানে প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম।'

'তোমার কথা ভারি সুন্দর।'

'তুমি আমায় এত প্রশ্রয় দিয়ো না।'

'কেন দেব না? তুমি আমার বন্ধু। আমি তোমায় ভালোবাসি।'

'তুমি এদেশে আমার প্রথম বান্ধবী।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'ছ'মাস এখানে আছো, কোনও বান্ধবী হয় নি?'

'না। যা সহজে পাওয়া যায়, তাতে আমার লোভ নেই।'

'আমাকে তো সবচেয়ে সহজে পেলে।'

'এ সহজ সবচেয়ে কঠিন।'

'ঠিক বলেছো। এ সহজ যে কতো কঠিন, কতো দুষ্প্রাপ্য তা যে পেয়েছে সেই জানে।'

লুসিলের সহজ ভালোবাসায় কিছুক্ষণ আমি ডুবে রইলাম। 'কত না আদরে রসের বাদরে নিমগন কৈল মোরে'।

এক সময় বলল, 'তোমার বয়স কতো?'

'পঁচিশ।'

'আমি তোমার চেয়ে বড়। কতো বড় তা বলবো না।'

'বোলো না। তোমার বয়স নেই। কোনদিন থাকবে না।'

'ধন্যবাদ। এমন সুন্দর সুন্দর কথা শিখলে কোথায়?'

'সুন্দরের স্পর্শে সুন্দর কথা বেরিয়ে আসছে। বিয়ে করো নি কেন?'

'ইচ্ছে নেই। ব্যালেরিনাদের বিয়ে না করাই ভালো।'

'বাজে কথা।'

'আসল কথা কি জানো? ভালোবাসার পুরুষ পাওয়া যায়। ভালো-লাগার পুরুষ বড় চোখে পড়ে না। বিয়ে করতে গেলে ভালোবাসার সঙ্গে ভালো-লাগা খুব দরকার। বোধ হয়, বেশি দরকার। ভালোবাসা তো স্তিমিত হয়ে আসবে কিছুদিন পরে। তখনও যদি

ভালো না লাগে, তা'হলে এক সঙ্গে থাকা যাবে না। পুরুষ আমায় বড় সহজে ক্লান্ত করে।'

'আমিও করবো।'

'তুমি বোধ হয় করবে না। তা ছাড়া, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কতোদিন থাকবে? তুমি আর আমি দুই পথের মানুষ। আমাদের পথ বড় একটা একত্র হবে না।'

'তোমার মধ্যে এই বিষণ্ণতা এলো কোত্থেকে?'

'তোমাকে ভালোবেসে।'

'বিষণ্ণতা তোমাকে পরম কমনীয় করেছে। দেখ না, সূর্যের মধ্যে বিষাদ নেই; তার দিকে তাকানো যায় না। চাঁদের আছে।'

'তুমি সুন্দর কথা বলো। সব ভারতীয়েরাই কি এমন কথা বলে?'

'অত্যন্ত দেশপ্রেমিক হয়েও একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করবো না।'

'লুসিল হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। গভীর দৃষ্টিতে তাকাল আমার চোখে। আমার বুক কাঁপল। এ সেই: 'তবে মুখপানে রাখিয়াছি মেলি, সর্বগ্রাসী আঁখি।'

লুসিল বলল, 'তুমি যেয়ো না। এখানেই থাকো।'

'না, না। তা হয় না।'

'কেন হবে না?'

'এ হচ্চে কর্নেল য়ুনিভারসিটির কেন্ট হল। তুমি ছাত্র-ছাত্রীদের অতিথি। সকালে তোমাকে দেখতে অনেকে আসবে। আমার ঘুম ভাঙে ন'টায়। যদি একবার ঘুমিয়ে পড়ি, উঠতে বারোটা হবে।'

'ঘুমুবে কেন?'

'না, না। চলো বাইরে যাই। নদীর ধারে বসি। গল্প করি।'

লুসিল হাল্কা হেসে উঠল।

'তুমি সুভদ্র। নারী-খাদক নও। যেমনি ভেবেছিলাম, তুমি তাই। চলো বাইরে যাই।'

লুসিলকে নিয়ে নদীর ধারে গেলাম। এখন শেষ শরতের রাত কোমল চাঁদের আলোয় কমনীয়। জ্যোৎস্না নেমেছে নদীর বুকে, গাছের পাতায়, সবুজ ঘাসে। আমরা বেঞ্চিতে বসলাম। লুসিল ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল, আমি ঘনিষ্ঠতর হলাম।

গল্পে, প্রেমে, রাত শেষ হয়ে এলো। যখন লুসিলকে কেণ্ট হলে পৌঁছে দিলাম তখন সকাল চারটে।

ঘরে ফিরে জামা-কাপড় না ছেড়েই বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমি তখন আস্ত একটা মানুষ নই। গলে মজে অখণ্ড অমিয়। বিকশিত-সরসিজ-ললিত। বিকশিত পদ্মের মতো ললিত।

ঘুম ভাঙল টেলিফোনের বার বার তার চীৎকারে। ঘুমে অবশ হাত দিয়ে রিসিভার ধ'রে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বললাম, 'কে?'

'ম-নো-জ!'

নিদ্রা ছুটে গেল।

'লুসিল!'

'ঘুমচ্ছ?'

'ঘুমুচ্ছিলাম।'

'কটা বেজেছে জানো?'

'সবে প্রভাত হ'ল।'

'একটা-চল্লিশ।'

'আমার যখন নিদ্রাভঙ্গ, তখন প্রভাত।'

'চলে এসো।'

'কোথায়?'

'এখানে।'

'আসছি। আধঘণ্টা সময় দেবে তো?'

'সাতাশ মিনিট।'

গিয়ে শুনলাম লুসিল আটটায় উঠে প্রাতঃরাশ করেছে, ন'টায় সোমশংকরনের সঙ্গে ক্যাম্পাস দেখতে বেরিয়েছে, এগারটায় রিহার্সাল দেখতে গেছে, একটায় লাঞ্চ খেয়ে ঘরে ফিরে ফোন করেছে। পিল্লে দুপুরে কর্নেল শহর দেখতে যাবার নিমন্ত্রণ করেছিল, ক্লান্তির বিনীত কারণ দেখিয়ে রেহাই নিয়েছে।

প্রশ্ন করলাম, 'ঘুমুবে না?'

'দিবানিদ্রা দেহের মেদ বাড়ায়। তুমি কি চাও আমি মোটা হয়ে যাই?'

'তবে কি করবে?'

'নিঃসঙ্গে তোমার সঙ্গলাভ।'

'তুমি যে বাঙালি হয়ে গেলে। বাংলাদেশের মেয়েরা এমন রোমান্টিক কথা বলে।'

'ভুলে যেয়ো না আমি অর্ধেক ফরাসী।'

'ফরাসিনী বলতে আমরা যা বুঝি, তুমি তা নও।'

'কি ক'রে জানলে?'

'চিনে। বুঝে।'

'চলো।'

'কোথায়?'

'নদীতে।'

'নদীর ধারে?'

'নদীবক্ষে।'

'ডুববে নাকি?'

'ডুবে গেছি। আপাতত ভাসবো।'

'তরী তীরে ফিরবে তো?'

উত্তরে লুসিল একটা ফরাসী প্রবাদ বলল : নদীর তীর আছে, তাই সে সমুদ্র-পিয়াসী।

এমনি ক'রে কেটে গেল সারাটা দিন। সন্ধ্যার নৃত্য-উৎসব শুরু হ'ল। সোমশংকরন্ পিল্লেকে বাহবা দিল সবাই। উৎসবকে মনোরম করবার কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি তার। লুসিল নাচল, তার সঙ্গে নাচল কলেজের একটি আমেরিকান ছেলে। নাচ শেষ হবার পর ডিনার। ডিনারের পর হৈ-হৈ আড্ডা। সোমশংকরন্ এক সময় বলল, 'লুসিল, এ শহরটা ভারি সুন্দর। জ্যোৎস্না আছে। চলো বেড়িয়ে আসি।'

লুসিল আপত্তি করল, 'রাত বারোটা। ঘুম পাচ্ছে।'

আমি বললাম, 'যাও না! শহরটা সত্যি সুন্দর।'

'তুমি যাবে সঙ্গে? তাহলে চলো।'

সোমশংকরনের মুখ কালো দেখে বললাম, 'তোমার দয়ার শেষ নেই। তোমার প্রার্থী তো কেবল আমি নই। আমরা সবাই। সোমশংকরন্‌কে বঞ্চিত কোরো না।'

লুসিল গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুমি যাবে সঙ্গে? তা'হলে চলো।'

অগত্যা যেতে হ'ল। সোমশংকরন্ চটল। কিন্তু আমার কী করার ছিল বলো?

ঘণ্টা দু'এক আমরা শহরে ঘুরে বেড়ালাম। কর্নেল থেকে চলে গেলাম ইথাকা। ফিরে আসতে প্রায় সাড়ে তিনটে। পিল্লে গাড়ি থামলো কেণ্ট হলে। লুসিল নেমে গেল। নামবার আগে কানে কানে বলল, 'তুমিও নেমে পড়ো।'

অত বেহায়া হ'তে পারলাম না। কিন্তু পিল্লে বোধ করি লুসিলের অনুরোধ শুনতে পেয়েছিল।

বলল, 'মনোজ, তোমাকে ডরমিটরিতে নামিয়ে দেব, না হেঁটে যাবে।'

'তোমাকে আবার একটু ঘুরতে হয়,' চটপট বলে ফেললাম। 'এখানেই নামি। খোলা হাওয়ায় এটুকু পথ হাঁটতে ভালো লাগবে।'

ঘরে যাওয়া আর হ'ল না সে রাত্রে। তাই বলে লুসিলের ঘরেও গেলাম না। দু'জনে গিয়ে বসলাম আবার নদীর ধারে। যতক্ষণ না প্রভাতের আলো ফুঠে উঠল।

লুসিল বলল, 'আমি তো একটু পরেই চ'লে যাবো।'

বললাম, 'আজ তোমাকে যেতেই হবে?'

'আজ নয়, আজ সকালেই। সন্ধ্যায় আমার নাচ আছে।'

'কখন ট্রেন?'

'দশটায়।'

'তা'হলে আর দেরি কোথায়?'

'তুমি কি ক্লান্ত বোধ করছো?'

'একটুও নয়।'

'ঘুমুতে দিলাম না তোমায়।'

'ঘুমের সময় অফুরন্ত।'

'তুমি চলো আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'নিউ ইয়র্কে।'

'যাবো। আজ নয়। একদিন যাবো।'

'দেরি কোরো না। কবে যাবে? আগামী সপ্তাহে?'

'না। আসছে মাসে।'

'ঠিক বলছো?'

'ঠিক।'

লুসিলের ওঠবার সময় হ'ল। সোমশংকরন্ আসবে স্টেশনে নিয়ে যেতে।

'তুমি স্টেশনে যাবে না ?'

'না।'

'বেশ, যেয়ো না। কিন্তু ঘরে বসে থাকবে। এখান থেকে নিউ-ইয়র্ক যেতে গাড়ি থামবে তিনটে স্টেশনে। প্রত্যেক স্টেশন থেকে আমি তোমায় কল করবো।'

'জো হুকুম।'

'তুমি আমাকে পাগল ভাবছো না তো ?'

'ভাবছি। পাগল তুমি একা হও নি। আমাকেও করেছ।'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো ?'

'বাসি।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি। প্রথম দেখার ভালোবাসা। জীবনে এই প্রথম। আর, বোধ হয় এই শেষ।'

লুসিল চলে গেল। আমি ঘরে ফিরে দাড়ি কামিয়ে খেতে চলে গেলাম। ফিরে এসে টেলিফোনের সামনে বসলাম। লুসিল যেমন বলেছিল, তেমন করল। তিন স্টেশনে নেমে ফোনে কথা বলল। মিনিট খানেকের কথা। চুরি-করা দম-আটকানো কথা। মৃদু মৃদু কহতহিঁ ভাষা।

প্রথম স্টেশনে গাড়ি থামল সাড়ে এগারটায়। ফোন বাজল আমার ঘরে।

'লুসিল ?'

'ম-নো-জ ?'

'তোমার স্বর শুনতে ভালো লাগছে।'

'আমি সারা পথ তোমার কথা ভাবছি। টের পাচ্ছো ?'

'পাচ্ছি।'

'ঘুমোও নি ?'

'না।'

'এখন ঘুমিয়ো না। একটার পরে যতো ইচ্ছে ঘুমিয়ো।'

'ঘুম আসবে না।'

'ম-নো-জ!'

'লুসিল!'

'গার্ড বাঁশি বাজাচ্ছে। আমি যাচ্ছি।'

'আচ্ছা।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'আমি তোমাকে।'

এমনি আরো দু'বার। একটা পর্যন্ত আমার চোখে ঘুমের নাম নেই। সে-যে কী রুদ্ধশ্বাস আনন্দ-প্রতীক্ষা তা যে না করেছে, সে বুঝবে না।

প্রেম কাকে বলে? আদিম প্রশ্ন, উত্তরের শেষ নেই। আমার কাছে প্রেম স্বর্গীয় রহস্য। নারী পুরুষের কাছে অনন্ত রহস্য নিয়ে উপস্থিত, পুরুষ নারীর কাছে। সে রহস্য দেখে বড় বিস্ময় লাগে। চেয়ে চেয়ে দেখার শেষ হয় না, বুঝে বুঝেও না, বোঝা থেকে যায়, পেয়ে পেয়েও মনে হয়—কিছু বুঝি পেলাম না। বিদ্যাপতির একটি কবিতা মনে পড়ছে। রাধা কৃষ্ণকে বলছে, এত ভালোবাসি তোমায়, মনে হয় তুমি আমার হাতের দর্পণ, মাথার ফুল। তুমি আমার চোখের কাজল, গলার হার। দেহের সর্বস্ব, গৃহের সার। পাখির যেমন পাখা, মাছের যেমন জল, প্রাণীর যেমন প্রাণ, তেমন তুমি আমার। এত বলেও রাধার কিছু বলা হ'ল না। তাই কৃষ্ণকে প্রশ্ন করছেন, 'তুহুঁ কৈছে মাধব, কহ তুহু মোয়' : মাধব, তুমি যে কে তা আমি বুঝতে পারছি না, তুমি বলে দাও আমায়।

এ রহস্য পেয়ে বসেছিল লুসিলকে। দু'দিন পরে তার চিঠি এলো। অস্থির হয়ে চিঠি খুললাম। একখানা সবুজ পত্রে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বার বার সে মাত্র একটি শব্দ লিখেছে : ম-নো-জ।

পরের মাসে সত্যি আমি নিউ ইয়র্কে হাজির হলাম। ট্রেন থেকে নেমে দেখি লুসিল। সে জানতো আমি আসছি। কিন্তু স্টেশনে আসতে তাকে লিখি নি।

আমার হোটেল ঠিক ছিল।

ট্যাক্সিতে বসে হোটেলের ঠিকানা লুসিলের হাতে দিলাম। লুসিল ক্যাবম্যানকে অন্য ঠিকানা বলল।

'কোথায় যাচ্ছি?'

'আমার ঘরে।'

'সে কি?'

'তুমি আমার অতিথি।'

তিনদিন থাকবো ব'লে গিয়েছিলাম। লুসিল আমাকে সাতদিন রেখে দিল। সে সাতদিনের কথা তোমায় বলতে পারবো না। ভাষা নেই। থাকলেও বলতাম না। লুসিল একদিনও নাচতে গেল না। এক মুহূর্ত আমরা কাছ ছাড়া হলাম না। আমাকে সুখী করার জন্যে লুসিল যেন পাগল হয়ে গেল। এমন ক'রে নিজেকে দিল, জীবনে আমি যা' আর কখনও পাই নি। এমন ক'রে আমায় নিল, যা' জীবনে আর কাউকে দিতে পারি নি। লুসিল আমায় পূর্ণ সৌন্দর্যে সাতদিন ঘিরে রাখল। তার দেহের সৌন্দর্য দেখে আমি চমকিত, পুলকিত, বিস্মিত, অবলুণ্ঠিত হলাম। এমন নিখুঁত নিবিড় নিপুণ সৌন্দর্য আর কোথাও দেখি নি। শুধু লুসিল সুন্দর নয়: তার ঘর, আসবাব, বিছানা, কথাবার্তা, ব্যবহার সব সুন্দর। সাতদিন আমি সৌন্দর্য-সমুদ্রে ডুবে রইলাম।

লুসিলের দুঃখ মাত্র একটা। বার বার বলল, 'ম-নো-জ, আমার দুঃখ, তুমি আমার জীবনে প্রথম পুরুষ হয়ে এলে না। তোমাকে আমার কুমারী দেহ দিতে পারলাম না। তোমার কুমার দেহ নিলাম। জীবনে আমার বড় সম্পদ হয়ে রইলে তুমি।'

সে বছর লুসিলের সঙ্গে আরো ছু'বার দেখা হ'ল। তখন আমাদের মধ্যে জানাজানি প্রায় পূর্ণ। লুসিল তার জীবনকাহিনী সব বলেছে আমায়। সে কাহিনী আশ্চর্য। কিন্তু আজকের কাহিনীর বাইরে। সময় আর মন হ'লে আর একদিন বলবো।

তৃতীয় বার দেখার পর যে দিন বিদায় নিল, সেদিন লুসিল বলল, 'ম-নো-জ, তোমার ভবিষ্যৎ কি ?'

'অন্ধকার।'

'না। উজ্জ্বল। তুমি অনেক বড় হবে। অনেক মেয়ে তোমার প্রেম চাইবে।'

'এই বড় ?'

'তুমি ডক্টরেট হয়ে কি করবে ?'

'দেশে ফিরবো।'

'তারপর ?'

'চাকুরী নেব।'

'কোথায় ?'

'ভারতবর্ষে চাকুরীর স্বর্গ হ'ল সরকার।'

লুসিল ঈষৎ নাক সিঁটকালো।

'বিয়ে করবে না ?'

'করবো।'

'কাকে ?'

'বাপ-মার নির্বাচিত কোন এক অপরিচিতা অবগুণ্ঠনবতীকে।'

'ভালোবাসতে পারবে ?'

'পারা উচিত।'

'তখন মনে পড়বে আমাকে ?'

'তোমাকে ভুলবো না।'

'ম-নো-জ! তুমি আমায় বিয়ে করবে ?'

'তুমি রাজি আছ ?'

'না, তুমিও রাজি নও। অত বোকা তুমি নও।'

'লুসিল !'

'তবু, লোভ যে আমার হয় নি তা নয়। লোভ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এও জানি যে আজ আমি চাইলে তুমি আমায় বিয়ে করবে !'

'নিশ্চয় করবো।'

'এজন্যে নয় যে তুমি আমায় এত ভালোবাসো যে, বিয়ে না ক'রে তোমার উপায় নেই। এজন্যে, যে তোমার সম্মানবোধ প্রখর।'

'আমি তোমাকে বিয়ে করবো দুই কারণেই। বলো, তুমি রাজি আছ।'

'না। আমি রাজি নই। তুমিও আসলে রাজি নও।'

একটু পরে লুসিল আবার বলল, 'আমার মাকে তোমার কথা বলেছি। মা বললেন, একটি নির্দোষ বিদেশী ছেলের জীবন নষ্ট ক'রে দিয়ো না। ভালোবাসছ, ঠিক আছে ; তাকে বাঁধতে যেয়ো না।'

লুসিল বলল, 'এই যে আমাদের ভালোবাসা, ম-নো-জ, এ-ও অমর নয়। তোমার ও আমার কাছে পর্যন্ত এর তাৎপর্য এক নয়। প্রেম হচ্ছে ভ্রান্তিহীন পথিক, বহুরূপী পান্থ। এক-এক জনের কাছে এক-এক রূপে তার আবির্ভাব। তুমি আমার প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম, আমার জীবনের প্রথম অনুদ্ঘাটিত রহস্য। আমি তোমার কাছে নিখুঁত সৌন্দর্য। যদি আমি কম সুন্দর হতাম, তুমি এমনি ক'রে ভালোবাসতে না আমাকে। বলো, ঠিক কিনা ?'

'তুমি সত্যিই অপূর্ব সুন্দর। শুধু দেহে নয় ; মনে, প্রাণে, বুদ্ধিতে।'

'তোমার মুখে প্রশংসা শুনে দেহে আমার শিহরণ লাগে। অথচ আমি জানি, তোমার কথা ভুল। তোমার মতো বিদ্যা আমার নেই, বুদ্ধি আমার নেই। আমার জীবন একেবারে আলাদা। আমেরিকায় কেন, সারা পশ্চিমে, শো-ওয়াল্‌র্ড-জীবন যে কতো কদর্য, ভাবতে পারো

না। অনেক দাম দিয়ে এখানে সামান্য স্বীকৃতি পাওয়া যায়। আর যে-দাম প্রথম দিতে হয়, বার বার দিতে হয়, তা হচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত পুরুষের দাবির কাছে দেহ সমর্পণ। নকল উত্তেজনায় আমাদের জীবন সন্ধ্যারাত্রে নাচঘরের মতো আলো ঝলমল। উত্তেজনা ও আনন্দ তো এক কথা নয়, ম-নো-জ।

পরের মাসে লুসিল লিখল, 'আমি প্যারিসে যাচ্ছি ছ' মাসের জন্য। নাচবো, নাচ-শিখবো। তারপর য়ুরোপের কয়েকটা দেশে ঘুরে বেড়াব। যাবার আগে একবার তুমি এলে বড় সুখী হই। তোমার পরীক্ষা সামনে যদি না পারো, এসো না। য়ুরোপ থেকে তোমায় মাঝে মধ্যে চিঠি লিখবো। বছর পর ফিরবো, তখন তুমি হয়তো জীবনস্রোতে ভেসে অন্য তীরে পৌঁছবে। আমাদের বিচ্ছেদ শুরু হ'ল, ম-নো-জ। বিচ্ছেদে আপত্তি নেই। বিস্মৃতিকে ভীষণ ভয়। ভয় করে—নিজেকে বড় অসহায়, শূন্য মনে হয়, যখন ভাবি, তুমি আমায় একেবারে ভুলে গেছ।'

পরীক্ষার আর তিনমাস বাকি ; লুসিলের কাছে যেতে পারলাম না। তুমি ভাবছ, এ আমার কি-রকম ভালোবাসা! বুঝতে পারছ না, এটুকু বাস্তব-বুদ্ধি আছে বলেই আমি কোথাও একটু দাঁড়িয়েছি। পরীক্ষায় ফেল করলে মার্কিন স্কলারসিপ নিয়ে টানাটানি পড়বে, দু'বছরের বেশী স্কলারসিপ পাওয়া যাবে না। তা' ছাড়া, জীবনে দাঁড়াতে হবে—বিধাতার এই নির্দয় নির্দেশ আমার মনে সর্বদা বেজে চলতো। লুসিলের সঙ্গে এক সপ্তাহ কাটানো মানে একমাস সৌন্দর্যের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা। যতই না আকাঙ্ক্ষিত, সে অমৃতে মুখ দেবার সর্বনাশা ইচ্ছা আমাকে দমন করতে হ'ল।

তা'হলেও তখন ভাবি নি কালের স্রোত এমনি ক'রে বইবে। পরীক্ষায় ফল খুব ভালো হ'ল। অধ্যাপক বললেন, তুমি মাস ছ'এক

ইয়েলে কাজ ক'রে এসো ; ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। ইয়েল আমেরিকার সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়। এমন উদার সুযোগ সহজে জোটে না ; এক কথায় রাজি হলাম। কাটল ছ'মাস ইয়েলে। লুসিলকে জানিয়েছিলাম, সে আনন্দে উছলে-ওঠা চিঠিতে অভিনন্দন পাঠাল। মাসে অন্তত একবার লুসিল চিঠি লিখত। ইয়েল থেকে ফিরে এসে আমি পড়াশোনায় ডুবে গেলাম। ডক্টরেট পেতে হ'লে ফাঁকি দেবার জো নেই। এমনি ক'রে যখন আমি থীসিস তৈরির ভয়াবহ সংগ্রামে নিবিষ্ট, তখন লুসিলের চিঠি বার্তা নিয়ে এল : আমি নিউ ইয়র্কে ফিরে এসেছি। সময় পেলে একবার এসো।

সময় আমার তখন হ'ল না। শুধু যাবার নয়, চিঠির জবাব দেবারও। তখন প্রতিজ্ঞা করেছি সপ্তাহে বাবাকে একখানা কার্ড ছাড়া আর কোনও চিঠি লিখব না। লাইব্রেরীতে, ঘরে, বই এর মধ্যে ডুবে থাকবার মধ্যে মাঝে মাঝে লুসিলের অনন্য সৌন্দর্য চোখের সামনে ফুটে উঠত। তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেতাম। মন আনন্দে, শান্তিতে, আলোয় ভরে যেত।

থীসিস দাখিল করবার পর কিছুটা অবকাশ মিলল। কিন্তু এত দিনের অবিরাম পরিশ্রমে দেহ গেল বিগড়ে। দু'সপ্তাহের জন্যে যেতে হ'ল হাসপাতালে।

সুস্থ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একদিন লুসিলকে খবর না দিয়ে নিউ ইয়র্কে গিয়ে হাজির হলাম। স্টেশন থেকে ফোন ক'রে জবাব পেলাম না। ট্যাক্সি নিয়ে লুসিলের অ্যাপার্টমেণ্টে গিয়ে দেখলাম, দরজা বন্ধ। লুসিল গেছে হনলুলুতে নাচতে।

তারপর ঘটনাচক্র অন্য বৃত্তে ঘুরে গেল। ডক্টরেটই শুধু পেলাম না, অধ্যাপকের উচ্চ প্রশংসাও পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে সান্ ফ্রানসিসকো বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ জুটে গেল। চলে গেলাম। সেখান থেকে নিউ ইয়র্ক অনেক দূর। লুসিলও অনেক দূর।

লুসিলকে লিখলাম, 'আমার নিউ ইয়র্ক যাওয়া সহজ নয়। নতুন কাজ ; পরিশ্রম ভয়ানক বেশি। তুমি একবার এখানে এসো।'

লুসিল জবাব দিল, 'একটা নতুন ব্যালেতে প্রধান ব্যালেরিনার কনট্রাক্ট পেয়েছি। মরবার সময় নেই। কিন্তু প্রথম সুযোগেই তোমাকে দেখে আসবো। তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছে হয়। আমি এখনও সুন্দর আছি। তোমার সামনে গিয়ে এখনও দাঁড়াতে পারবো।'

নিশ্চয় লুসিল খুব ব্যস্ত ছিল। রাত বারোটায় লং ডিস্ট্যান্স-এ কল ক'রেও দু'দিন তাকে পেলাম না। সকালে হয়তো পেতাম। কিন্তু সকালে আমার সময় হ'ত না। তা' ছাড়া ভাবতাম, হয়তো দুটো তিনটায় ফিরে এসে ঘুমিয়েছে ; সকালে ঘুম ভাঙানো উচিত হবে না।

এমনি ক'রে ছ'মাস কেটে গেল। আমি জাতিপুঞ্জে চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম। ডাক এলো। আবার হাজির হলাম নিউ ইয়র্কে। কিন্তু মাত্র এক দিনের জন্যে।

লুসিলকে টেলিফোনে পেলাম। তখন সে বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত। বলল, 'ম-নো-জ, যদি এলে, তবে আজ এলে কেন ? আজ আমার এক মুহূর্ত সময় নেই। এক কাজ করো। তুমি আমার ব্যালে দেখতে এসো। গ্রীনরুমে কার্ড পাঠিয়ো। দেখা হবে।'

'শো'র পরে ? কি করছ ?'

'হায় ঈশ্বর ! শো'র পরে আমাদের ওখানে আজ পার্টি আছে। কখন শেষ হবে কেউ জানে না। নাচ দেখতে এসো। আসবে তো ?'

'দেখি। সময় করতে পারলে যাবো।'

গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম, টিকেট নেই। সবচেয়ে বেশি দামের টিকেটও বিক্রি হয়ে গেছে। কাউন্টারের সামনে বিষন্ন মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম। পোস্টারে নৃত্যরতা লুসিলের ছবি। মনে হল, এ অন্য লুসিল ! একে আমি চিনি নে। অন্য পৃথিবীর, অন্য লুসিল।

একটি মেয়ে এসে বলল, 'আপনি কি মিঃ বাসু?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার জন্যে একখানা কমপ্লিমেণ্টারি আছে। আসুন।'

লুসিলের ব্যালে দেখলাম। একটি ফরাসী উপকথাকে আধুনিক সাজ-পোষাক পরিয়ে ব্যালের কাহিনী তৈরি হয়েছে। এ নৃত্যের সৌন্দর্য তখন আমি বুঝতাম না; শুধু দেখলাম লুসিলকে। মঞ্চের জাদু আলোয় তাকে মনে হচ্ছিল অপার্থিব সৌন্দর্যের তরঙ্গ। সুন্দরের সমুদ্রে তরঙ্গের পর তরঙ্গ।

প্রথম বিরামে বাইরে এসে একজন কর্মচারীকে বললাম, আমি মিস লুসিলের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

তাচ্ছিল্য, বিস্ময়, ঔৎসুক্য তার চোখে।

'তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'ওঃ, তিনি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন? তাই নাকি? তা'হলে ওদিক দিয়ে চলে যান।'

গিয়ে দেখলাম, বহু লোকের ভিড়। স্ত্রী-পুরুষ। বৃদ্ধ, মধ্যবয়সী, যুবক, তরুণ। হাতে দামী দামী ফুলের তোড়া।

স'রে পড়লাম। বেচারা লুসিল! সে তারকা হয়েছে। এখন অনুক্ষণ জ্বলতে হবে। স্তিমিত আলোয় নিভৃত ভালোবাসার অবসর আর হবে না।

হোটেলে গিয়ে চিঠি লিখলাম, 'তুমি ব্যবস্থা সবই করেছিলে, কিন্তু দেখা হ'ল না। তোমার ঘরের সামনে দেখলাম দর্শনপ্রার্থীর ভিড়। আমি তোমার ফ্যান্ নই, তোমার বন্ধু। তোমাকে অমনি ক'রে দেখা আমার সম্ভব নয়। লুসিল, আমাদের কবি গান বেঁধেছেন, 'যে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে?' যদি উত্তর জানা থাকে, লিখো।'

এ কাহিনী এখানে শেষ হতে পারত, হ'ল না। দু'সপ্তাহের মধ্যে

জাতিপুঞ্জের চাকরি নিয়ে সান ফ্রানসিসকো থেকে সোজা চলে গেলাম ব্যাংককে।

চার বছর পর আবার আসতে হ'ল নিউ ইয়র্ক। তখন আমি অনেক বদলেছি। অনেক অন্যতর সৌন্দর্যের তরঙ্গ দেখেছি, পেয়েছি অনেক দিয়েছি কিছু। লুসিলের সঙ্গে পত্রের যোগাযোগ অনেকদিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিউ ইয়র্কে এসে লুসিলকে দেখবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম।

পুরানো ফোন নম্বরে কল্ ক'রে অন্য নারীর ধ্বনি শুনতে পেলাম। কিন্তু লুসিলের ঠিকানা পাওয়া কঠিন হ'ল না। লুসিল তখন নাম-করা ব্যালেরিনা।

ভেবে ভেবে ঠিক করলাম ফোন করব না। চিঠি লিখলাম। 'চার বছর পর আমি আবার নিউ ইয়র্কে। একমাস থাকবো। তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে। তুমি এখন নাম-করা ব্যালেরিনা। আমাকে যদি ভুলে গিয়ে থাক, তোমার দোষ নেই। তুমি একদিন বলেছিলে, বিস্মৃতিকে তোমার বড় ভয়। আমি তোমায় ভুলি নি। তোমার সৌন্দর্য এখনও আমার মন ছেয়ে আছে।'

তিন দিনের দিন উত্তর এলো। লুসিলের নিজের হাতে লেখা।

'ম-নো-জ, তুমি যে এখনও আমাকে, আমার সৌন্দর্যকে, মনে রেখেছ তার জন্যে কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। তুমি একমাস আমার শহরে, ভাবতে ভালো লাগছে। তোমাকে আমি ভুলি নি, কোনও দিন ভুলবো না। চার বছর আগে একদিন বহু স্তাবকের মধ্যে তোমাকে খুঁজে নিরাশ হয়েছিলাম। বড় ইচ্ছে ছিল তুমি সেদিন আমাকে একবার দেখ। তখনও আমার সৌন্দর্য ছিল। তোমার সামনে দাঁড়াবার মতো সুন্দর সেদিনও আমি ছিলাম। আজ আর নেই। আমার বয়স হয়েছে। আমি আর সুন্দর নই। সবাই আমার যে সৌন্দর্য দেখে আজও মুগ্ধ, তার অনেকখানি নকল। তুমি তা দেখতে পাবে না, তোমাকে তা দেখতে দেব না। তোমার কাছে আমার যে

স্মৃতি, তা সুন্দরের। সে স্মৃতিতে আমার বড় লোভ। তা ভেঙে গেলে জীবনে এক বড় সম্পদ থেকে আমি বঞ্চিত হবো। আমি চাই, যখনই তুমি আমাকে মনে করো, আমার কথা ভাবো, যেন দেখতে পাও আমার সে-সৌন্দর্য যা আর কেউ দেখে নি, আর কারুর দেখবার চোখ ছিল না, মন ছিল না ; আর কাউকে দেখাবার মতো প্রেম আমার বুকে ছিল না।

'তুমি, ম-নো-জ, আমাকে আর দেখতে পাবে না। আমি আর সুন্দর নই। কিন্তু তুমি এখনও সুন্দর, আমার কাছে চিরসুন্দর। আমি তোমাকে একবার দেখতে চাই। আজ সন্ধ্যা সাতটায় টাইম স্কোয়ারের দক্ষিণ কোণে যে গির্জা আছে ওখানে তুমি মেন গেটের সামনে দাঁড়াতে পারবে? যদি পারো তবে তোমার এক দিনের বান্ধবীর জন্যে এ অনুগ্রহটি কোরো। আমি তোমাকে দেখবো। তুমি সাতটা থেকে সাতটা পনের পর্যন্ত দাঁড়িয়ো। আমি তোমাকে অনেকক্ষণ দেখতে চাই। আমাকে খুঁজবার চেষ্টা কোরো না। খুঁজে পাবে না।

একদিন তুমি প্রশ্ন করেছিলে, যে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে? তোমাদের কবির মুখেই এই কাতর জিজ্ঞাসা শোভা পায়। উত্তর আমার জানা নেই।'

টাইম স্কোয়ারের সে গির্জা আমার চেনা। লুসিল যেত সেখানে প্রার্থনা করতে। সন্ধ্যা সাতটায় আমি মেন গেটে দাঁড়িয়েছিলাম। পনের মিনিট নয়, আধ ঘণ্টা। লুসিল এসেছিল। রাস্তার ওধারে গাড়ি পার্ক ক'রে সে আমায় দেখছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম : লুসিল এসেছে, গাড়ি থামল, লুসিল আমায় দেখছে। আমি একবারও গাড়ির দিকে তাকাই নি। কিন্তু লুসিল জানে নি, সে-ই-শুধু দেখে নি আমায়, আমিও একমনে তাকে দেখেছি। দেখেছি যে লুসিলের সৌন্দর্য অবিনশ্বর। যে-সৌন্দর্য যৌবনের। সে যৌবন জীবনের চেয়েও বড়। 'জীবন চাহি যৌবন বাড়ো রঙ্গ।'

কুহা

উত্তর কলকাতার গলি। রাস্তার উপর দেওয়ালের গায়ে নাম যা আছে তার প্রয়োজন প্রচুর। নাম না থাকলে ঠিকানা থাকে না, ঠিকানা না থাকলে মানুষের ঘর-বাড়ির ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত। ময়দানে, মনুমেন্টের পাদদেশে, যখন জনতা সমবেত হয়, তখন তার নাম নেই, ঠিকানা নেই। অথচ প্রত্যেকটি মানুষের যেমন নাম আছে, তেমন ঠিকানাও। যারা রাস্তায় শোয়, ঘুমোয়, খায় এবং আরও অনেক কিছু করে তাদেরও একটা-না-একটা ঠিকানা আছে। আছে বলেই তারা ব্যক্তি। না থাকলে তারা জনসমুদ্রের এক এক ফোঁটা নোনা জল।

উত্তর কলকাতায় যে গলির কথা বলছি তার নাম কাহিনী বিন্যাসে অপ্রয়োজনীয়। এমন অনেক গলি রয়েছে কলকাতার উত্তর, মধ্য, পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে। কোনও এককালে রাস্তায় পীচ্ পড়েছিল, এখন মাটি, টুকরো ইট ও কয়লা-কুঁচির জমাট দারিদ্র্য। নর্দমা সর্বদা নোংরা ; রাস্তা কাটিয়ে ময়লা জল তুলে মানুষ স্নান করে। বাসন ধোয়, কাপড় কাছে। জলে রাস্তা সর্বদা কর্দমাক্ত। দু'ধারে দোতলা তেতলা বাড়ির কয়েক শত বাসিন্দা পরিবার পরস্পরের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা ক'রে রাস্তায় ময়লা ফেলে। ডাস্টবিন নামক বস্তুটির সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র বর্তমান : আসলে গোটা রাস্তাটা—যেমন গোটা কলকাতাটাই—ডাস্টবিন। পরিবর্জিত ময়লা থেকে লোম-ওঠা কুকুরের সঙ্গে প্রায়-উলঙ্গ মানুষও খাদ্য খুঁজে বার করে। দোতলার সরু জানলা দিয়ে কেরানী-বাঙালী রবিবার দুপুরে পানের কষ ফেলেন ; তাঁর গৃহিণী প্রতিদিন বাচ্চার পাইখানা পার ক'রে দেন। আবার এ

পথেই সযত্নে কোঁচা বাঁচিয়ে আপিস-ফেরত বাঙালীবাবু একগুচ্ছ রজনীগন্ধা এক হাতে অন্য হাতে বাজারের থলি বহন ক'রে নিজের শান্তির নীড়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

গলির দু'ধারে গায়ে-গা-ঠাসা বসত বাড়ি, বেশীর ভাগ দোতলা, তিনখানি তেতলা। বড় রাস্তার ওপর এর মধ্যে গদাই পালের আজগুবি এক পাঁচতলা কুড়ি-ফ্ল্যাটের দিয়াশলাই আকারের বিরাট বাড়ি। তার সঙ্গে ডান দিকে বিস্তৃত বস্তি। বস্তি পেরিয়ে আবার গলি, আবার বাড়ি, আবার বস্তি। তারপরে তেলের কল : "সাউচরণ সরিষার তৈল" অনেক ভেজাল নিয়ে নির্ভেজাল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতার প্রতিশ্রুতি বহন ক'রে রোজ ওখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। তেলের কলের পাশে আবার ছোট্ট গলি: দিনের বেলাও স্ত্রীলোকেরা সেজেগুজে পান চিবোতে চিবোতে গলিত পুরুষকে কটাক্ষে প্রশ্ন করে, পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ? তারা বাস করে বস্তিতে, যে বস্তির চারিদিকে আরও অনেক গলি, অনেক বসত-বাড়ি, অনেক মানুষ, আবার তেল বা আটার কল, অসংখ্য দোকান, ফাটা নর্দমা, ভেজা রাস্তা, ডাস্টবিনের ভগ্নাংশ, ময়লার স্তূপ, রজনীগন্ধার সৌরভ, রবীন্দ্রসংগীতের সুর, তুলসীদাসের দোঁহা, রামা হৈ, রামা হৈ! এক কথায় কলকাতা।

যে গলির কথা বলছি, তার একেবারে শেষের বাড়ি। দোতলা ওপরে চারখানা ঘর, নিচে তিনখানা। ওপরে বাড়িওয়ালা। নিচে ভাড়াটে।

ঠিক বাড়িওয়ালা নয়, বাড়িউলি মাসিমা।

বয়স ষাট পেরিয়েছে। এককালে অতিশয় সুন্দরী ছিলেন, সন্দেহ নেই। এখনো দেহের রঙ সোনা, বড় বড় চোখে প্রাচীন কান্তি। মাঝারি লম্বা দেহ মেদভারে কিছুটা স্থূল না হ'লে মাসিমা এখনও সুন্দরী। দাঁত পড়ে নি, কিন্তু চুল ছাঁটা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে দুখানি মোটা মোটা সোনার বালা। মাসিমার কণ্ঠস্বর স্বচ্ছ,

সুরালো, কথা বলেন নাটকীয় ভঙ্গীতে। চোখ নাচিয়ে হাত ঘুরিয়ে, টেনে টেনে।

তিন ছেলে। বড় ছেলে কোনও অর্কেস্ট্রায় বেহালা বাজায়। তার বৌ আছে। বৌএর সন্তান নেই। মেজ ছেলে ইলেক্‌ট্রিকের কাজ জানে। মিস্ত্রী। ছোট ছেলে কলেজে পড়ে।

তিন মেয়ে। বড় মেয়ে থাকে চিৎপুরে। প্রায়ই আসে মায়ের কাছে। মোটা-সোটা সুন্দরী। মেজ মেয়ে হাতিবাগান বাজারের কাছে গ্রে স্ট্রীট থেকে নিষ্ক্রান্ত এক গলিতে। ছিপছিপে ফর্সা ফ্যাকাসে। চোখের নিচে কালি। ছোট মেয়ে, ছোট ছেলের মতো, কলেজে পড়ে। বেথুনে, ফার্স্ট ইয়ারে।

বড় ছেলের নাম বরেন্দ্র, সাধারণ পরিচয় বরুবাবু। স্ত্রীর নাম কমলা। মেজ ছেলে মহেন্দ্র, চলতি নাম মহেন-মিস্ত্রী। ছোট ছেলের নাম দীনেন্দ্র, দীনু। বড় মেয়ে সোনা, মেজ মেয়ে বরুণা।

মাসিমার নাম রত্নপ্রভা।

ছোট মেয়ের নাম মোনা।

মাসিমা নাম সই করেন রত্নপ্রভা দাসী। ছেলেরা সবাই সিংহ!

ছোট মেয়ে নাম লেখে মোনা সিন্‌হা।

নিচের তলায় পরিবার ছোট। প্রতাপ গুহরায় বিদ্যাসাগর কলেজে দর্শন পড়ান। পঞ্চান্ন বছর বয়স, মাথা-ভরা অগোছাল শাদা চুল, চোখে মোটা কাঁচের চশমা। ছোট্ট-খাট্ট দেহের তুলনায় মাথা বেমানান বড়। মুখে চোখে দার্শনিক-সুলভ নির্লিপ্ততার চিহ্নমাত্র নেই। বরং সর্বদা সবকিছু সম্বন্ধে জাগ্রত কৌতূহল। সরু গলায় একটু চেঁচিয়ে কথা বলার অভ্যেস। ছটফটে, চটপটে চটুল চালচলন। বেশবাসে সৌখীন। আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবি এবং ফরাসডাঙা বা শান্তিপুরী ধুতি পরেন। পায়ে হরিণ-চামড়ার চটি। বুকে সোনার বোতাম, সোনার চেন সমেত পকেট-ঘড়ি; পকেটে পর পর সাজানো পাঁচটি দামী

কলম। কলম কেনা প্রতাপ গুহরায়ের সখ। ক্লাসে গিয়ে রেজিস্টার খুলে প্রত্যেকটি কলম এক একবার পরীক্ষা করেন। একটি যখন বর্জিত হয়ে পকেটে ফেরত যায়, ছেলেরা ঐকতানে বলে ওঠে : এইটি নয়। চারবার বলার পর সবচেয়ে জোরে ধ্বনিত হয় : আজ এইটে। প্রতাপ গুহরায় মুচকি হাসেন।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপ গুহরায়ের জাগরণ। রাস্তায় কিছুক্ষণ পায়চারি করেন। ফিরে এসে স্টোভ জ্বেলে চা তৈরি ক'রে পত্নীকে জাগান। চা-পানের পর একঘণ্টা নোট লেখেন। তারপর বাজারে যান। বাজার সেরে এসে পুনরায় এককাপ চা। তারপর স্নানাদির সেরে কলেজের পথে বার হন। ফেরেন রাত ক'রে। বেশ একটু নেশা ক'রে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন প্রায় অবিরত সরু গলায় চেঁচিয়ে কথা বলেন। স্ত্রীর সঙ্গে, নিজের সঙ্গে। যাকে চোখের সামনে পান তারই সঙ্গে। নোট লিখতে লিখতেও কথা বলেন। যা লেখেন তা বলে বলে লেখেন।

স্ত্রীর নাম গঙ্গা। একেবারে জমাট গঙ্গা। উঠতে কষ্ট, তাই বেশি সময় ব'সে থাকেন। একেবারে দরকার না হ'লে অমন ভারী দেহ তুলতে চান না। কথা বলেন খুব কম। বিরাট গোল মাংসল মুখে, মাংসের দেওয়ালে দেওয়ালে লুকানো ছোট ছোট চোখে সর্বদা মৃত্যু জমাট বরফ হয়ে আছে। নিজেকে নিয়ে ধারাবাহিক মরে আছেন প্রতাপ গুহরায়ের স্ত্রী। দেহ হালকা হ'লে বোধহয় কখনও কখনও বসতেন। অত ভারী দেহে তা সম্ভব নয়।

সব সময় একটি কম-বয়সী ঝি আছে। নাম রানী। সবকিছু সে হাতের কাছে এনে দেয়। গঙ্গা রান্না করেন। রান্না ক'রেই তাঁর বেশী সময় কাটে। রানী বাসন মাজে, ঘোরদোর সাফ করে, কাপড় কাচে, বিছানা পাতে, তোলে। গঙ্গার গাত্রোত্থানে সাহায্য করে। রানী সকালে আসে, দুপুরে গঙ্গাকে শোবার ঘরে বিছানায় পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যায়।

আবার অপরাহ্নে আসে। রাত্রিতে ন'টায় তার ছুটি। দাদাবাবুর খাবার পর। প্রতাপ গুহরায়ের খাবার ঢাকা থাকে। মাঝে মাঝে সে খাবার সকালবেলা ফেলে দিতে হয়।

রানী থাকে কাছেই, ফ্ল্যাট-বাড়ির গায়ে লাগা বস্তিতে।

পরিবারের চতুর্থ মানুষ দাদাবাবু। সমরেশ।

ন' মাস আগে প্রতাপ গুহরায় ছিলেন সিমলা পাড়ায়। একতলায় একখানা ঘরে। কেবল স্বামী-স্ত্রী, কারণ সমরেশ তখন কাশীতে, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। গঙ্গার বাপের বাড়ি বারাণসী। বড় মামার কাছে থেকে সমরেশ পড়তো। এম, এ, পাস করার পর সে যখন কলকাতায় এল, প্রতাপ গুহরায় বাসা বদল করলেন। সমরেশ চাকরি করবে। তার ঘর চাই। আর, বাসা চাই একতলায়। গঙ্গা দোতলায় উঠতে পারবেন না। পেতে পেতে উত্তর কলকাতার গোয়াবাগানের এই গলি!

সমরেশ যেদিন এসে পৌঁছল তার পরের দিন বাসা বদল।

ছেলেকে দেখে প্রতাপ গুহরায় বড় বিব্রত হলেন। লম্বা নয়, কিন্তু তাঁর মতো বেঁটেও নয়। তাঁর মতো রোগাও নয়, মার মতো মোটা তো নয়ই। মাথা একেবারেই বড় দেখায় না। ছোট্ট ক'রে চুল ছাঁটা। চোখে চশমা নেই। মুখে কেমন কর্কশ কাঠিন্য। কথাবার্তা কদাচিৎ বলে। তাও প্রায়ই এক শব্দে।

"কেমন আছো?"

"ভালো।"

প্রতাপ গুহরায়ের ভালো লাগল না। তাঁর স্বর সরু, জোরালো। এ কথা বলে আস্তে, গলার স্বর মোটা।

"ওখানে সব ভালো?"

"হ্যাঁ।"

"কলকাতা ভালো লাগবে তো?"

উত্তরে শুধু অনিশ্চিত চাহনি।

"কি করবে ?"

"দেখি।"

"কলেজে কাজ করবে ?"

"পাই তো।"

"মার অবস্থা দেখেছ ?"

"হুঁ।"

"বিরাট লাশ হয়ে বসেছেন।"

এবার চোখ তুলেও মন্তব্য নেই।

প্রতাপ গুহরায় ঘরে পায়চারি করছিলেন। গঙ্গা রান্নাঘরে।

"তোমার তো একটা ঘর চাই।"

সাড়া নেই।

"গোয়াবাগানের দিকে একটা নতুন বাসা ঠিক করেছি।"

"বেশ তো।"

"দোতলা বাড়ি। পুরো একতলাটা আমাদের। তিনখানা ঘর। একটা আমি নেব। একটা তোমার মার। তৃতীয়টা তোমার।"

"কালই বাসা বদল করতে হবে।"

"আচ্ছা।"

"তুমি কি আজ একবার দেখে আসবে নাকি ?"

"না।"

প্রতাপ গুহরায় ভেতরে ভেতরে রেগে গেলেন। এই ছেলেটা কি সত্যিকারের আমার ? মনে পড়ল কোনও এক মহাজনের কথা : পিতৃত্ব সর্বদা অপ্রমাণ্য, একমাত্র মাতৃত্বই প্রমাণ্য। কে কার জনক কে বলতে পারে ? এক্ষেত্রে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ চুলের চেয়েও ক্ষীণ। গঙ্গা অন্যপুরুষের দেহে কদাপি প্রেমাবেগে প্রবাহিতা হয়েছেন ভাবাও অসম্ভব। সুতরাং জনক তিনিই। আমি বাপ, আর উনি মা। অথচ

ছেলেটা একেবারে আলাদা। ছোটবেলা থেকেই। কোনও দিন আমি ওকে বুঝলাম না। চিনলামই না যেন ভালো ক'রে। ম্যাট্রিক পাস ক'রে চলে গেল মামার কাছে। তাঁরা বললেন আমাদের কাছে থেকে পড়ুক, আমিও রাজী হয়ে গেলাম। কেন? ওকে চিনি না, জানি না বলেই তো? গঙ্গাও আপত্তি করলেন না। ব'লে বসলেন, "পাঠিয়ে দাও। এখানে থাকলে তোমার দেখাদেখি মদ খাবে। আরো অনেক কিছু করবে।" গা জলে গেল। দিলাম পাঠিয়ে।

সে অনেক বছর আগেকার কথা। গঙ্গা তখনও এত ভারি হন নি। তখনও উঠতে বসতে পারতেন স্বল্লায়াসে। প্রতাপের চুল এত পাকে নি। তখনও বসন্ত বেঁচে ছিল। রাত্রি আনন্দময়ী ছিল। জীবনে নেশা ছিল।

ছেলেটা মামাবাড়ি চলে গেল। প্রতাপ বছরে বছরে পক্ককেশ হলেন। গঙ্গা অনেক, অনেক মোটা হলেন। উঠতে বসতে সাহায্যের দরকার হ'ল। ছেলেটা ক্রমে ক্রমে এম এ পাস ক'রে ফেলল। দর্শনে নয়। ইতিহাসে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিভাগেই পাস হ'ল। তারপর আবার সেই পুরানো কলকাতায় পুরাতন বাপের কাছে, পাকাচুল বাপ আর জ্যান্ত লাশ মায়ের কাছে, ফিরে এল। লালটে চোখ, কর্কশ চাহনি, মোটা বিরাট নাক, পুরু বেঁটে, চওড়া চোয়াল, উঁচু প্রশস্ত কপাল, মোটা গলা, বোবাটে ধরন: ছেলেটা ফিরে এল। অপরিচিত অতিথি এল ঘরে।

ভয়ে ভয়ে প্রথম দিন প্রতাপ গুহরায় সন্ধ্যা হতেই বাসায় ফিরে এলেন।

সিমলা থেকে গোয়াবাগান এমন কিছু পথ নয়। একখানা ঘরের সংসার এমন কিছু ভারী নয়। সংসারের সবচেয়ে ভারী বস্তু গঙ্গা। ট্যাক্সিতে ওঠানো মুশকিল হতে পারে ভেবে প্রতাপ গুহরায় ফিটন গাড়ি আনলেন। সিমলায় ও গোয়াবাগানে রাস্তার লোকেরা মজা পেল।

বাসা বদলের ঝক্কি প্রতাপ নিজেই সামলালেন। বস্তিতে গিয়ে একটি রাতদিনের ঝি খোঁজ করতে রানীকে পেয়ে গেলেন। বেশি বয়স নয়। বেশ মেয়েটি। ডেকে নিয়ে এলেন বাসায়। রানী কাজে লেগে গেল। মাইনে যা চাইল প্রতাপ গুহরায় তাতেই রাজী হলেন। বললেন, "বাসাটা চটপট গুছিয়ে নাও তো বাছা। নগদ একটাকা বকশিশ পাবে'খন।"

সমরেশ এল প্রায় সন্ধ্যার দিকে। সকালে না খেয়েই বেরিয়েছিল। কোথায় না কোন চাকরির খোঁজে। প্রতাপের কাছে এসে বলেছিল :

"আমি বেরুচ্ছি। সন্ধ্যে নাগাদ নতুন বাসায় আসব।"

প্রতাপ কিছু বলতে পারেন নি। অবাক হবার, এমন কি রাগবার, পর্যন্ত সময় পান নি।

সন্ধ্যাবেলা সমরেশ খুঁজে খুঁজে এই গলির এই বাড়ির সন্ধান পেয়ে দরজায় কড়া নাড়ল। যিনি দরজা খুললেন তাঁর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সমরেশ সোজা ভেতরে চলে এল।

দরজায় ঢুকে দশ পা এগোলে অপরিসর উঠোন। মাঝামাঝি চৌবাচ্চা। বাইরের। এক পাশে কলঘর। সঙ্গে পাইখানা। উঠোনের দক্ষিণ দিকে সরু বারান্দার পর সমরেশের ঘর। গলির ওপর শুরু, কলঘর পর্যন্ত বিস্তৃত। বেশ বড় ঘর। দেওয়ালে বই রাখার দরজাহীন শেল্‌ফও আছে। তা ছাড়া প্রায় উলঙ্গ। মেঝেতে সতরঞ্চির ওপর বিছানা পাতা। একপাশে দেওয়ালের সঙ্গে তার বাক্স, স্যুটকেশ। দেয়ালে পেরেক ঠুকে দড়ি বেঁধে তার ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ধুতি, গেঞ্জি, তোয়ালে, শার্ট, পাঞ্জাবি। বাক্সের পাশে চপ্পল। বারান্দা পেরিয়ে অন্য দুখানা ঘর। একখানা গলির ওপর। প্রতাপ গুহরায়ের ঘর। অন্যখানা গঙ্গার। গঙ্গার ঘরের সঙ্গে লাগানো রান্নাঘর। দুখানা ঘরের খাটে বিছানা তৈরি। প্রতাপ গুহরায় সারাদিনের

পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। গঙ্গা রান্নাঘরের সমস্ত মেঝে জুড়ে স্থবির হয়ে আছেন।

চৈত্র মাস। গরম পড়েছে। সমরেশ কলঘরে ঢুকে স্নান করল। জামা কাপড় ধুয়ে বেরিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকে বাক্সের ওপর বসল।

এমন সময় রানী এসে বলল, "মা ডাকছেন।"

সমরেশ গেল। মায়ের খুব কাছে যেতে পারল না। ভয় হ'ল। বিতৃষ্ণা হ'ল। রানী চা দিল।

"চাকরি হ'ল?" গঙ্গা অতি কষ্টে প্রশ্ন করলেন। অনেকবার ভারী ঠোঁট কাঁপল। অতি কষ্টে কথা ছুটি বার হ'ল।

"না।"

গঙ্গা কি যেন আরও বললেন। সমরেশ বুঝতে পারল না।

রানী প্রশ্ন করল, "রাত্রে কি খাবেন, ভাত না রুটি?"

"রুটি।"

"কখন খাবেন?"

সমরেশ কিছু জবাব না দিয়ে ঘরে চলে গেল। রানীকে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখল না।

নিজের ঘরে এসে বসল। বিছানায়, বই হাতে ক'রে। ছু'পাতা পড়তে চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। নরম কালো ঘুম। নিটোল, নিবিড়, নিরালা ঘুম? পুঞ্জ পুঞ্জ তরঙ্গিত অন্ধকার···স্নেহময়, প্রেমময়। আলোর মতো নিষ্ঠুর নয়, দাম্ভিক নয়, কঠোর আদায়ী নয়। সমব্যথায়, নীরব, সহানুভূতিতে কোমল, আত্মদানে একান্ত নিঃশেষ।

এক সময় রানী এসে দেখল। দেখে রাগল, মুচকি হাসল। ভাবল, ডাকবো, না ঠেলে তুলব? করল না কিছুই। গঙ্গাকে গিয়ে বলল, দাদাবাবু ঘুমুচ্ছেন। গঙ্গা মরা চোখে তাকিয়ে রইলেন। রানী তাঁকে খাবার দিল। তিনি খেলেন। রানী রান্নাঘর ধুয়ে দিল। প্রতাপ গুহরায়ের খাবার তাঁর ঘরে ঢেকে রাখল। গঙ্গাকে অতি

কষ্টে তুলে নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর বস্তিতে চলে গেল।

শুয়ে শুয়ে গঙ্গা একবার ভাবলেন, ভাবতে চেষ্টা করলেন, কে যেন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরবে, কাকে যেন দরজা দিতে হবে খুলে। সিমলার বাসায় দরজা ভেজানো থাকতো। এ বাসায় তা হবার নয়। ওপরের ও নিচের এক দরজা।

কে খুলবে দরজা? কে আসবে অনেক রাত্রে? খুলবে কি কেউ দরজা কারুর জন্যে? বোবা অবশ চিন্তা অন্ধকারের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর একসময় গঙ্গার ঘুমের অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল।

আচমকা ঘুম ভাঙল। এসেছিল নিঃশব্দ, গোপন-পদক্ষেপে, ভালোবেসে না জানিয়ে, পালাল ভয় পেয়ে, ত্রস্তপদে, তুচ্ছ ক'রে। নিয়ে এসেছিল মোহময় অন্ধকার; রেখে গেল নির্বোধ, কুটিল তমসা।

জেগে গিয়ে সমরেশের কানে বিচিত্র শব্দের অসংলগ্ন কুৎসিত আওয়াজ ভেসে এল। যেন অনেক লোক এক সঙ্গে কথা বলছে। যেন বারাণসীর গঙ্গাতীরের কীর্তন, মণিকর্ণিকা ঘাটে জ্বলন্ত শ্মশানের হরিবোলের সঙ্গে মিলিত হয়ে গোধূলিয়ার গলিতে হীরাবাঈএর কণ্ঠে আশাবরীর কোমল ধৈবতে হোঁচট খেয়ে অন্ধকার রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। ভারী নারী কণ্ঠ, মিহি মেয়েলি স্বর, কাঁদা-কাঁদা স্ত্রী-বচন, ঢলে-পড়া রমণী হাস্য, পুরুষের ধেড়ে গলার চওড়া বুলি, হো-হো হাসি, যুবাকণ্ঠের উত্তেজিত কথা, হঠাৎ বেহালার তারে কাটা সুরের আর্ত ঝংকার। সমরেশের সময় লাগল নিদ্রার সীমাহীনতা থেকে জাগরণের সংকীর্ণ সংক্ষেপে ফিরে আসতে। নিদ্রা দিগন্তে পরিব্যাপ্ত—চেতন, অবচেতন, অচেতনে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতে। এই খণ্ডিত রজনীর ক্ষুদ্রতার মধ্যে জাগরণ সমরেশকে নির্দয় ধাক্কায় ঠেলে দিল।

দোতলার লোকেরা সশব্দে বেঁচে আছে। চেঁচিয়ে, কথায়, গল্পে, তর্কে, বকুনিতে, ধমকে, হট্টগোল হাস্যে, কাঁদুনিতে, বেহালার আর্ত

ঝংকারে। কলকাতা। অনির্বচনীয় ধারাবাহিক অন্ধকার। পচা গলি, বস্তি, তেলের কল, আটার কল, বসত-বাড়ির গায়ে বসত-বাড়ি, মানুষ লোক, জন, জনতা সবার ওপরে একমাত্র মিথ্যা, যাহার উপরে নাই। নতুন বাসা—ওরা নতুন লোক; আমিও নতুন মানুষ। এ ঘরের অন্ধকারটাও নতুন, মশার আস্ফালন, চৈত্র রাত্রির গুমোট গরম, গায়ের ঘাম সবকিছু নিয়ে নতুন। বারাণসীর গঙ্গায় রাত বারোটায় যে অন্ধকার ঢেউয়ে ঢেউয়ে হেলে দুলে নেচে নেচে বেড়ায়, কাছে ডাকে, কানে কানে কথা বলে, সে পুরাতন ঐতিহাসিক অন্ধকার কলকাতায় নেই। এ অনেক মানুষের গায়ের ঘামে স্যাঁতসেঁতে প্যাঁচপেচে অন্ধকার, মদো গন্ধে নকল-উত্তেজনায় ক্ষুধার্ত অন্ধকার। নকল, ভেজাল অন্ধকার। ভেজাল ঘুম। ভেজাল জাগরণ।

খিদে পেয়েছে। হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। না খেয়ে। স্নান ক'রে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলাম। নিকোলে মেকিয়াভেলির জীবনী। ঘুম এল। কে যেন একজন ডাকতে এসেছিল। ঐ মেয়েটা। নতুন বাসার নতুন ঝি। জাগলে ভালো হোতো। না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম এখন পেটে খিদে। মা কি কষ্ট পেল? মা কি কোনও দিন কষ্ট পেয়েছে? কষ্ট পেতে হ'লে বেঁচে থাকতে হয়। মা কি কোনও দিন বেঁচে ছিল। না কি শুধু ছিল, আছে, আরও থাকবে। বড় গরম। ভ্যাপসা বিশ্রী নোংরা গরম। গলির গায়ে জানলা দিয়ে রাত্রের কলকাতা দেখা যাচ্ছে। এস্‌প্লানেড-চৌরঙ্গী নয়, নিউ মার্কেটের কলকাতা নয়। আসল, প্রাচীন, অমৃত পিয়াসী অমর কলকাতা। এখানে রাস্তায় জন্মে মানুষ রাস্তায় মরে। আকাশের নিচে শুয়ে তারার আলো আর ঘুমন্ত গ্যাসপোস্টের মিটমিটে কৌতূহল অবজ্ঞায় তুচ্ছ ক'রে উলঙ্গ জনপথে মানুষ-মানুষী অমৃতমন্থন করে। এখানে ভ্যাপসা স্বপ্ন আর-প্যাঁচপেচে অভাব জড়াজড়ি ক'রে ছোট ছোট ভীরু বুকে মরিয়া হয়ে আঁকড়ে থাকে।

ওপরে বিরাট হাসির আচমকা বোম্ ফাটল।

ভারী পুরুষ গলায় কে বলল, "দিন, দিন, এ বাড়িটা বেচে দিন। টাকা যা পাবেন, তার সঙ্গে কিছু যোগ ক'রে যোধপুর পার্কে নতুন বাড়ি করুন।"

পুরুষ-কণ্ঠে জবাব হ'ল: "মাকে তো বলছি। কতবার বললুম। মা শোনে কৈ?"

এবার নাটকীয় নারী কণ্ঠ: "সাহস হয় না, বাবা। সাহস হয় না।"

পুরুষ-কণ্ঠ: "এতে এমন সাহসের কি দরকার?"

নাটকীয় নারী-কণ্ঠ: "তা তোমরা বুঝবে না, বাবা। ভয় করে। কেমন একটা চাপা ভয়। কাউকে বলতে পারিনে কিসের ভয়। কিন্তু আমি তো জানি, বাবা, আমি সব জানি।"

"কি বলছেন বুঝতে পারছি না।"

"বুঝে কাজ নেই, বাবা। বুঝে কাজ নেই। বুঝে কাজ নেই। বুঝলে তুমি আর কিছু ক'রে উঠতে পারবে না। তোমারও ভয় করবে। চাপা ভয়। গোপন ভয়। তখন আর রক্ষে নেই।"

"বাজে বোকো না, মা।"

"তুমিও বুঝবে না, বরু। তুমি জানলেও বুঝবে না। বাজে আমি বকছি না। যা বলি ঠিক বলি। এ বাড়ি আমি ম'লে বেচে দিও। আমি যতোদিন আছি, এখানেই আছি।"

"এখানে থাকতে আপনার ভালো লাগে?"

"ভালো লাগে কিনা জানিনে। কর্তা মাঝে মাঝে এ প্রশ্ন করতেন। সে অনেকদিন আগের কথা। তখনও বলতে পারি নি, ভালো লাগে। কিন্তু অভ্যেস হয়ে গেছে। ঐ যে, বট গাছটা দেখতে পাচ্ছ, বাবা, ঐ বস্তির মাঝখানে, ওকে আমি চুয়াল্লিশ বছর ধ'রে দেখে আসছি। ও আমার সব জানে। আমি যা জানিনে, তাও

জানে। প্রায় ত্রিশ বছর আগে ঐ বটতলায় এক সাধু এসে জুটেছিলেন। বয়স কম, টানা টানা চোখ, সোনার মতো রং। সে এসে জুটল, দিনরাত গাছতলায় ব'সে ধ্যান করছে, নয় বই পড়ছে। মায়া হ'ল। একদিন গেলাম ডালা ভ'রে ফল মিষ্টি নিয়ে। চুপ ক'রে চোখ বুজে বসে ছিল। অপেক্ষা ক'রে রইলাম। যখন সে তাকাল—সে কী চাহনি, বাবা, এখনও গায়ে কাঁটা দেয়—সে অনেক দিনের অনেক কথা, বাবা। এ বাড়ি আমার ছাড়বার জো নেই।"

"কিন্তু, মা, তুমি তো আর একটা বাড়ি করতে পার!"

"ভগবান জানেন বাবা, ভগবান জানেন। টাকার কথা নয়। টাকা কী আছে তাও জানিনে, বাড়ি করতে কতো টাকা লাগে তাও জানা নেই। এ বাড়ি, বরু, তুমি অনেকবার শুনেছ, এ বাড়ি আমি করি নি, পেয়েছি। তোমার জন্মদাতা এ বাড়ি আমায় দিয়ে গেছেন। কিন্তু সে দানেও বিষ ছিল। অনেক মামলা, অনেক গোলমাল, অনেক অশান্তি হয়ে গেছে এ বাড়ির ওপর। আজ আর একখানা বাড়ি হলে তাতে বাস করবে কে?"

"কেন? আমরা?"

"তোমরা মানে তুমি আর তোমার বৌ? না তুমি ও তোমার রক্ষিতা?"

"আপনি ভাড়াও দিতে পারেন?"

"ভাড়া? কেন? কিসের দরকার? ভাড়া ছাড়াই আমার জীবনের বাকী বছরগুলি কেটে যাবে। ষাট পেরিয়ে গেছে। আর কতো দিন, বলো? ভাড়া খাটানোর জন্যে বাড়ির দরকার নেই। নিচের তলাটা ভাড়া দি, বাড়ির টেক্সর জন্যে—দিন দিন বাড়ছে; গত বছর দুশো টাকা ঘুষ দিয়ে আবার বাড়ানো বন্ধ করেছি। এর আগে যারা ছিল তারা অনেক জ্বালিয়ে গেছে। সব ভাড়াটেই জ্বালায়। আজ এসেছে নতুন ভাড়াটে। নতুন ক'রে জ্বালাবে।"

দরজা নিশ্চয় খোলা ছিল। কে যেন ঢুকল। শিস্ দিতে দিতে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

"এই যে মহেন এসেছ!"

"আপনি কখন এলেন?"

"তা কিছুক্ষণ। তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে?"

"চলে যাচ্ছে বরাট-দাদা।"

"শুনলাম বেশ দু'পয়সা আনছো আজকাল!"

"বদনামটা রটাচ্ছে কে? মিস্ত্রীর আবার দু'পয়সা!"

"মহেনকে বিয়ে দিলে না কেন, মাসিমা?"

"বিয়ে? বিয়ে আমি কাউকে দি' নে, বাবা। যার দরকার সে বিয়ে ক'রে নেয়।"

"কি মহেন, তোমার বুঝি বিয়ের দরকার নেই?"

"কি যে বলেন বরাট-দাদা। মিস্ত্রীর আবার বিয়ে!"

"দীনু কোথায়?"

"দীনু গেছে ব্যারাকপুরে। চলে আসবে।"

"আর মোনা?"

"মোনা বেরিয়েছে, বাবা। এসে যাবে এক্ষুনি।"

মানুষ কথা বলে কেন? এতো কথা কেন বলে? কাকে শোনায়? নিজেকে? পরকে? কাউকে না? ঈশ্বরকে? মানুষ কার সঙ্গে বেশি কথা বলে? পরের সঙ্গে না নিজের সঙ্গে? প্রতিদিন পৃথিবীতে কেবল কথায় যে শক্তির অপচয় হচ্ছে তাতে কটা আণবিক বোমার শক্তি? কতো শত সহস্র কথার কতো শত সহস্র পুনরাবৃত্তি! একই সময়ে কতো লক্ষ মানুষ একই কথা একই কাজ, একই অভ্যাসে, একই ভঙ্গীতে যন্ত্রের মতো ক'রে যাচ্ছে! এই বিরাট যন্ত্রজীবনের কারখানা চলেছে কি ক'রে, চলছে কেন, কার গরজে, কার প্রয়োজনে, কার হুকুমে, কি উদ্দেশ্যে?

মার ঘর থেকে ভয়ংকর বিশ্রী আওয়াজ আসছে। উঠে পড়ল সমরেশ। বাইরে এসে টের পেল ওপরে আনন্দের আসর বসেছে। মদ ও মাংসের উগ্র গন্ধ। মার ঘরের দরজা ভেজানো। ঠেলতে খুলে গেল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সমরেশ শুনল সেই আওয়াজ। আরও ভয়ানক। আরও বিশ্রী।

"মা!"

গঙ্গা জবাব দিলেন না। মা ঘুমুচ্ছেন। বিশ্রী আর ভয়ংকর আওয়াজ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ও নাসিকা গর্জনের ঐকতান।

চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে সমরেশ চোখে মুখে, মাথায় ঘাড়ে লাগাল।

ঘরে ফিরে এসে দেখল খিদে বেশ চড়েছে। তাকিয়ে দেখল এক কোণে কুঁজো-গেলাস। কুঁজো ঢাকা রয়েছে চীনেমাটির রেকাবীতে। রেকাবীতে একটুকরো সন্দেশ।

নতুন বাসার নতুন ঝির দয়া আছে।

জল খেয়ে সমরেশ শুয়ে পড়ল। ওপরে হাসির দমকা হাওয়া বইছে। মাঝে মাঝে বেহালার ঝংকার। সমরেশ বুঝতে পারছে কেউ একজন বেহালা হাতে নিয়ে গাল-গল্পে যোগ দিচ্ছেন। কথাবার্তা, হাসি-হুল্লোড়ের সঙ্গে, খেয়ালখুশি মতো, বেহালায় সুর তুলছেন। সুর মাঝে মাঝে কারুর কণ্ঠস্বরের নকল করছে, কখনও বা প্রতিধ্বনি। আবার কখনও কোনও রূপ-রাগিণীর বিক্ষিপ্ত টুকরো।

সমরেশ বই নিয়ে শুল। নিকোলো মেকিয়াভ্যালি। তার অন্যতম প্রিয় ঐতিহাসিক চরিত্র। য়ুরোপীয় কূট-নীতির জনক অথচ পা থেকে মাথা পর্যন্ত ফ্লোরেনটাইন। সম্ভোগে চতুর। কামনায় উগ্র। বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ। অথচ ভেতরে ভেতরে সব কিছুতেই গোপন বিরাগ। 'আমি হাসি; কিন্তু হাসি আমার প্রাণ স্পর্শ করে না। আমি জ্বলি, কিন্তু কেউ আমার কামনা দেখতে পায় না।' এ কি প্রাচীন ফ্লোরেন্স, না

বর্তমান পৃথিবী ? এ পৃথিবীর হাসি কি প্রাণ স্পর্শ করে ? এ পৃথিবী কি কামনায় জ্বলে ? এ পৃথিবীর প্রাণ আছে, কামনা আছে ?

গলিতে পায়ের শব্দ। দরজার কড়া বাজল। সমরেশ ভাবল, বুঝি বাবা এল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলল।

বাবা নয়। একটি মেয়ে। সস্তা প্রসাধনের চটুল গন্ধ। সমরেশ তাকাল। মেয়েটি তাকাল। প্রাণ স্পর্শ হ'ল না। কামনা জ্বলল না।

সমরেশের ঘুম পেল। মেয়েটি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল। তখন আনন্দ-সভা জমে বসেছে। মানুষের গলার পর্দা চড়েছে, শব্দের গায়ে শব্দ বেহায়া সোহাগে ঢলে পড়ছে।

একটু পরেই সমরেশ শুনল :

"এই যে মোনা এসে গেছে। এসো, এসো মোনা। তোমার জন্যে কখন থেকে ব'সে আছি।"

"কি রে তোর এত দেরি হ'ল যে ?"

"মোনা, তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। চমৎকার। খুব সুন্দর।"

'তুমি কি গা ধোবে, মোনা ? তাহ'লে কলঘরে চলে যাও। দেরি কোরো না।"

"এখন নেয়ো না, মোনা। গা না ধুয়েই তোমাকে বেড়ে দেখাচ্ছে।'

বোধহয় চোখে ঘুম লেগেছিল। হঠাৎ রেশ কেটে গেল। সমরেশ নাটকীয় গলার হুকুম শুনতে পেল : "মোনা, তুমি এবার শুতে যাও। আর জেগে থেকো না।"

"রাত কিছু বেশি হয় নি, মাসিমা।"

"বারোটা বেজে গেছে।"

"বারোটা কি কলকাতায় রাত, মাসিমা ?"

"মোনা, তুমি শুতে যাও।"

"একটু পরে যাচ্ছি, মা।"

আলো নিবিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সমরেশ। হঠাৎ ঘুম ভাঙল। কে যেন ডাকছে।

"সমরেশ! সমরেশ!"

উঠে ব'সে আলো জ্বালবার আগেই বুঝতে পারল, বাবা।

দরজা খুলে দিল। প্রতাপ গুহরায় নিজেকে সামলাতে পারলেন না। টলে পড়লেন। হাত বাড়িয়ে দরজা ধরতে গিয়ে পুত্রের গায়ে ঢলে পড়লেন।

সরু তীক্ষ্ণ গলা হঠাৎ করুণ কোমল কাঁদুনে শোনাল।

"একটু নেশা হয়ে গেছে।"

সমরেশ তাঁকে ঘরে পৌঁছে দিল।

"তুমি যাও শুয়ে পড়ো গে।"

জেগে থাকা আর ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যে ক্ষীণীয়মাণ সীমারেখার শেষতম সন্ধান আজও সমরেশ খুঁজে পেল না। দরজায় খিল দিয়ে আলো নিবোতে গিয়ে দেখল চোখে ঘুম নেই। বিছানায় পুনরায় নিকোলো মেকিয়াভ্যালির সঙ্গ নিল। পড়তে পড়তে ফ্লোরেন্সের প্রাচীন হোটেলে পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেমরত মেকিয়াভ্যালির চেহারা সমরেশের চোখে ভেসে উঠল। ছোট্ট খাট্ট শ্যাম বর্ণ কুৎসিত পুরুষ। বড়-সড় মাথায় বিদগ্ধ রাজনীতির সূক্ষ্ম খেলা সতত সঞ্চারিত। আর মুখে আর্ত হাসির দুর্বল ভগ্নাবশেষ। একসময় ফ্লোরেন্স গেল মিলিয়ে। প্রাচীনের চোখ চেপে অন্ধকার পথে বর্তমান এসে হাজির হ'ল। তখন বাতি নিবিয়ে সমরেশ অন্ধকারের মুখোমুখি। পুরো অন্ধকার নয় —তামাটে ভেজাল অন্ধকার। এ অন্ধকারের কাছে আত্মসমর্পণ করা যায় না। মন বলে, না তুমি নও, তোমাকে নয়, তোমার কাছে নয়। যে অন্ধকার মন চায় তা গভীর নিষ্কলুষ নির্ভেজাল, অসীম আকাশ হতে নেমে এসে যা গ্রাস করে, ঢেকে দেয়, স্নিগ্ধ করে। যেখানে চেতন মন অবচেতন হয়, জীবন হয় মৃত্যুর মতো মহান। কলকাতায় সে

অন্ধকার নেই। কলকাতার অন্ধকার আলোর অভাব। কলকাতার আলো কম-অন্ধকার। ঈশ্বরের সুপুত্র আলোর হুঙ্কার ছাড়বার আগে যে অন্ধকারে সৃষ্টি ধ্যানমগ্ন ছিল। যে অন্ধকার থেকে আলোয় যাত্রা অপ্রয়োজনীয়।

এ ঘরে কলকাতার ক্লান্ত ভেজাল বৃদ্ধ অন্ধকার। স্থবির, গলিত-নখদন্ত। তামাটে পর্দায় প্রেতছায়ার মিছিল। বিপুল দেহভারে নিষ্পেষিতা গঙ্গা। মা কি কোনও দিন বেঁচে ছিল? ছোট বেলায়ও মার অত মোটা শরীর দেখে কেমন ভয় হ'ত। মনে হ'ত ওর মধ্যে আটকে গেলে দম বন্ধ হয়ে মরে যাবো। এখন সে দেহ এত বিপুল যে তার মধ্যে মাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঐ দেহের মধ্যে, মাংস-স্তূপের মধ্যে মা হারিয়ে গেছে। মার বিশাল বুকের নিচে হৃদয় দম-আটকে ম'রে গেছে। বাবা কথা বলছেন। বাবা সারাদিন কথা বলেন। কলেজে ছাত্রদের সঙ্গে, অধ্যাপক কেরানী-বেয়ারা সবার সঙ্গে; কলেজের বাইরে যাকে পান তার সঙ্গে; নইলে নিজের সঙ্গে। 'একটু নেশা হয়ে গেছে।' একটু নয়, বেশ একটু। 'না, না, আমি মাতাল হই নি, মাতাল আমি কখনও হইনে।' মাতাল জীবনে ক'জন, বাবা? কি নিয়ে মাতাল, কাকে নিয়ে, কিসের জন্যে? কার জন্যে? ওপরেও ওরা 'একটু নেশা' করেছে। 'পয়সা চাই, বুঝলে মহেন, পয়সা না হ'লে কোনও মেয়েমানুষ কাছে আসবে না···পয়সা হ'লে এমন মেয়েমানুষ নেই যে আসবে না।' পুরাতন বস্তাপচা কামনার দুর্বল আস্ফালন। অমর কলকাতার প্রাগৈতিহাসিক অমৃত সন্ধান। 'বিয়ে একটা করতেই হবে বরাট-দাদা। কিন্তু মনের মতো মেয়ে পাচ্ছি না।' মনের মতো মেয়ে। মনের মতো একটু অন্ধকার দেবে আমায়? 'না, না, মাতাল হই নি। তুমি তো বলেছিলে আর একটু খেতে! ছেলেটা যে ঘরে আছে! খেলে কি হ'ত বলো তো!' বাবাও মনের মতো অন্ধকার পাচ্ছেন না। ছেলের আলো নেশার

অন্ধকারে ভেজাল মিশিয়েছে। মোদো বাপ মেদিনী মা, আর তুমি? তুমি সমরেশ গুহরায়। ইতিহাসের ছাত্র, বেকার কর্ম-সন্ধানী। কাজ করবো? কি কাজ? পড়াব? ইতিহাস? ত্রিশ বছর একটানা বলে যাবো হলদিঘাটের যুদ্ধের তাৎপর্য? তামাটে অন্ধকারে বিচরণ করতে পারার নাম বেঁচে থাকা। 'মোনা, তুমি শুতে এসো।' 'মোনা। মোনা লিসা। যাচ্ছে মাসিমা, আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।' ঘুমুন, মাসিমা, ঘুমুন। ঘুম বড় সুন্দর অন্ধকার। 'আমি একবার বেরুবো ভাবছি।' কে বলল যেন? যার নাম বরু। ওকে আমি চিনি। কাশীর গঙ্গাপারে এখন জনমানব নেই। ওখানেও অন্ধকার নিজের রূপ নিতে পারে না, কিন্তু তবু গঙ্গার জলে তার ছায়া বড় মধুর। মণিকর্ণিকায় চিতা জ্বলছে। হরেনের ছোট বোনকে এসময় পোড়ানো হয়েছিল। সুন্দর ছিল দেখতে সুনন্দা। ম'রে গিয়েও সুন্দর ছিল। চিতায় শুয়েও সুন্দর ছিল। হঠাৎ ভয়ানক কুৎসিত হয়ে গেল যখন চুল গেল পুড়ে আরো কুৎসিত বীভৎস হ'ল যখন মুখ পুড়তে লাগল। 'এত রাত্রে আবার কোথায় যাবে?' রমণীর নিষ্ফল নালিশ। 'তাতে তোমার প্রয়োজন নেই। দরজা খোলা রেখো।' বাবা হঠাৎ চুপ হয়ে গেছেন। ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধ হয়। সুনন্দার অমন সুন্দর শরীরটা দু'ঘণ্টায় ছাই হয়ে গেল। শ্মশানের এক পাশে দাঁড়িয়ে সুনন্দার আত্মা দেখছিল? শুধু নিজের দেহ পুড়ে ছাই হওয়া নয়, আমার মনটাও পুড়ে ছাই হচ্ছে কি না! মেয়েমানুষের কৌতূহল! ম'রে গিয়েও শেষ নেই। সুনন্দা বলতো না, আমি ম'রে গেলে তুমি দুঃখ পাও কিনা দেখতে হবে। আমার আত্মা এসে দেখে যাবে। মার ঘর থেকে অনবরত সেই বিশ্রী আওয়াজ আসছে। 'মোনা তুমি শুতে এসো। আমার ঘুম এসে যাচ্ছে।' ঘুম আসছে, একে একে সবাকার চোখে। না, সবাকার নয়। আমি ঘুমুই নি। ওপরের ওরা জেগে আছে। 'মোনা এক্ষুনি আসছে মাসিমা; আপনি ঘুমুন।' কাল যেতে হবে রজনী চ্যাটার্জির

বাড়ি। এককালে বেশ ভাব ছিল। এখন, মন্ত্রী হ'লেও, হয়তো মনে আছে। কলেজের কাজটা বোধহয় হয়ে যাবে। সুনন্দা বলেছিল, 'তুমি যাদের পড়াবে তারা মানুষ হবে না।' কারা পড়িয়ে কাকে মানুষ করেছে এ কালের ভারতবর্ষে? বাবা পড়িয়ে ক'জনকে মানুষ করেছেন? বাবা দর্শন পড়ান। সারাজীবন দর্শন পড়িয়েছেন। অথচ বাবার কোনও জীবনদর্শন নেই। বাবার এক ধরনের একটা সীসে-গলা দৃষ্টি আছে। কিন্তু দর্শন নেই। আমি তো ইতিহাস পড়াব। ভারতবর্ষের ইতিহাস। যা আজও লেখা হয় নি, যা আজও অজ্ঞাত। আমাদের চার হাজার বছরের অতীত আছে, ইতিহাস নেই। যেমন আমেরিকার ইতিহাস আছে, অতীত নেই। আমি ইতিহাস পড়াতে গিয়ে অতীত পড়াবো। যে অতীত কথা কয় না। তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন; নিস্তব্ধ যুগযুগান্তের ভারে বিষণ্ণ নিস্তেজ। আসল অন্ধকার। 'না আজ আর বাইরে যাবো না।' বরুবাবুর মত বদলাল। 'তোমরা বসো। আমি উঠছি।' ঘুম পেল বোধ হয়। 'তারপর মোনা।' তারপর যাহা ইতিহাসে তাহা কোনও খানে লেখা হয় নি। বেদব্যাসের নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। ভীষণ কদাকার চেহারা। মৎস্য-গন্ধা সত্যবতী তাঁর জননী। যমুনার তীরে তাঁকে দেখে হঠাৎ কামাতুর ঋষি পবাশর। চাই, চাই, সঙ্গম চাই। যোগবলে সৃষ্ট নকল কুজ্ঝটিকায় সরম লুকিয়ে মৎস্যগন্ধা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম দিল। তৃপ্ত পরাশরের বরে হ'ল সুগন্ধ-যুক্তা। এই তো ভারতবর্ষের ইতিহাস। এখনও ঘরে ঘরে ঋষি পরাশর। কুজ্ঝটিকায় সরম ঢেকে মৎস্যগন্ধাদের সুগন্ধযুক্তা করছে। তাদের বরে মৎস্যগন্ধাদের কন্যাভাব দূষিত হচ্ছে না। নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্ব 'না, না, না'। মোনা দিতে চাইছে না, তবু দিচ্ছে। মৎস্যগন্ধা আপত্তি জানাচ্ছে। কুয়াশা চাই। রাতের অন্ধকার যথেষ্ট নয়। কুয়াশা চাই। মহাভারতের রচয়িতার জন্ম নকল কুজ্ঝটিকায় লুকানো গর্হিত অবৈধ সঙ্গমে! ভারতবর্ষের ইতিহাসের সূচনা কুয়াশায়। কুয়াশায়

আর কামনায়। ঋষির পাশবিকতায়, কন্যার বেসরম কামে। 'না, না, না'। ওর নাম মোনা। মোনা মানা করেছে। কিন্তু ও যে মানে না মানা। এ মানার মানে নেই। সুনন্দা মানা করে নি। 'তুমি চাইলে, আমি দেব'। আমি চাই নি। তামাটে অন্ধকার পার হয়ে আসছে। শরীর নিস্তব্ধ হ'তে চলেছে। চেতনা হারিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন এই এক মৃত্যুর অমৃত আস্বাদ। মার ঘর থেকে আর বিশ্রী আওয়াজ আসছে না। ওপরের কথা আর শোনা যাচ্ছে না। শুধু শোনা যাচ্ছে বেহালার সুর। অন্ধকারের মধ্যে তরল হয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। কী সুর? চেনা, চেনা, অথচ চিনে নেবার আগ্রহ নেই। চিনে লাভ নেই। ভূপালী না শুদ্ধ কল্যাণ? ভূপালী পঞ্চম থেকে গান্ধারে নামছে। নামতে গিয়ে দেরি করছে। আর সে ভূপালী নেই। হয়ে যাচ্ছে শুদ্ধ কল্যাণ। মৎস্য-গন্ধা হয়ে যাচ্ছে সৌরভী। তবু তার কন্যাভাব যাচ্ছে না। আমি এখনও ঘুমুই নি। জেগে আছি। ভূপালী শুনছি—বা শুদ্ধ কল্যাণ। ঘুম যখন আসে দেখতে হবে। চেতন ও অবচেতনের সীমান্তে দাঁড়িয়ে এক অনাবিষ্কৃত পৃথিবীর রূপ-দর্শন করতে চাই। ঘুম, তুমি আস্তে আস্তে এসো। খুব ধীরে। দাঁড়াও আমার আঁখির আগে। অন্ধকারের আলোয় তোমায় দেখতে দাও। আমি এখনও আছি, এখনও, এখনও। একটা লোক সিঁড়ি দিয়ে নামছে খুব আস্তে আস্তে পা ফেলছে কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে কি যেন বলল, কাকে কি যেন বলল কে যেন কাকে কি বলল কি যেন বেহালায় কাকে যেন কি যেন কবে যেন কেন যেন কি ক'রে যেন কখন যেন কি ভেবে যেন কি ভাবে যেন বলতে গিয়ে বলল না বলতে পারল না বলে দেখল বলা হ'ল না কাকে কে যেন বলতে গিয়ে কেমন করে যেন বলা হ'ল না বলা হলেও বলা গেল না বলা গেলেও বলা হ'ল না······

থলথল চৌকো মুখ, তিনভাঁজ চিবুক, মোটা কাঁচের চশমা। ঠাস ক'রে চড় মারলে বোমা ফাটত নিশ্চয়, ছুনিয়া যেতো উল্টে, ছুনিয়ার নাম দিল্লী, অথবা ভারত। লোকটা ইয়া-মোটা, বাবা বলেন, দশজনের একজন। হাত আমার পাথর, গরম জ্বলন্ত পাথর, মাথায় রক্ত, কিন্তু, হে বিধাতা, তুমি ছেলেমানুষ, যেমন ছেলেমানুষ সব মানুষ, সব কালের সব মানুষ।

"তুমি ছেলেমানুষ বুঝবে না এসব জটিল সমস্যা।" বলতে পারল চৌকো মুখ, তিনভাঁজ চিবুক। "তোমার উচিত, বড়োদের কথা মেনে নেওয়া।" বড় মানে, পঞ্চাশ পঞ্চান্ন যাট আশি বছরের ছেলেমানুষ। "আফ্‌টার অল, ইউ আর জাস্ট্‌ অ' বয়।" ব্যঙ্গ-হাসি, তুচ্ছ-হাসি, আস্পর্ধা-হাসি থলথল মাংসকে ভেঙে চুরে চিবুকের ভাঁজে ভাঁজে ঝুলে পড়ল। আমার দাঁতে দাঁতে লাগল, কিন্তু হাত হ'ল পাহাড়ের মতো ভারী।

অনেক কিছু নৈসর্গিক কাব্যধারা প্রবাহিত হ'ল, জ্ঞান-অভিজ্ঞতা সত্নপদেশের প্রাচীন মনুমেণ্ট থেকে অনেক কথা, অনেকবার বলা কথা, আমি তাকিয়ে রইলাম পুরু-কাঁচ চশমার দিকে, দেখতে পেলাম, এই বিরাট ছেলেমানুষ দেখল না যে আমি দেখছি সাতান্ন বছরের উই-ঢিবি, পোকা কিলবিল করছে।

"হাসচো যে?"

তাই তো! হাসলাম যে! হাসা তো মানা মনুমেণ্টের পদদেশে।

"আই ডোণ্ট থিংক আই সেড্‌ এনিথিং ভেরী ফানি!"

না। আমি তোমার কথা শুনে হাসি নি।

"জীবনের কতোটুকু জানো তুমি? সবে তো জীবন শুরু করছ! ইউ আর জাস্ট অ' বয়।"

জানি না। কিছুই জানি না। তবু জানি তোমার এই এত বড় মাংসস্তূপের পাশে, নতুন আমদানি—আইন ফাঁকি দিয়ে আমদানি—শেভ্ ইম্প্পালার তুলতুল সীটে কি কর, কালই তুমি কাকে নিয়ে জিম্খানা ক্লাবে লাঞ্চের পর বিলিয়র্ড রুমে কি করছিলে, আমিও ছিলাম কাছাকাছি কম্লা নাগরাজকে নিয়ে, জানি, তুমি বাবার সঙ্গে চুপিচুপি কি সব আলোচনা কর; লুকিয়ে অনেকবার আমি শুনেছি তোমাদের কথা; জানি উইক এণ্ডে মাঝে মাঝে তোমরা দুজনে মিলে কোথাও যাও, কি সৎ-শুভ সুন্দর কাজে কাটে তোমাদের ছুটির অবসর, জানি তুমি কতো বিপদে পড়েছিলে তিনবছর আগে, পুলিশ কিসের দুর্গন্ধ পেয়ে তোমার পেছনে লেগেছিল, তুমি রোজ ছুটে আসতে বাবার কাছে, বন্ধ-দুয়ার পড়ার ঘরে চলতো তোমাদের পালাবার পথ-খোঁজা, তারপর

বাবা বললেন, "মনে রেখো যাঁর কথা তুমি শুনছো তিনি সাধারণ লোক নন, দশজনের একজন"

নিশ্চয়। তাও কি জানি নে? তুমি দশজনের একজন, বাবা দশজনের একজন। কেবল আমরা

জাস্ট্ অ' বয়।

"আমি তোমার প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলেছি। কলেজে তোমাকে ফেরত নেবে। শুধু তোমাকে একটা ফরম্যাল অ্যাপলজি দিতে হবে।"

দেব না। কলেজে যাবো না। ক্যাবলাকান্ত প্রিন্সির সামনে দাঁড়িয়ে মাপ আমি চাইবো না। বসবো না ঘেমো ক্লাসের নড়বড়ে বেঞ্চে, তাকিয়ে থাকবো না লেকচারারদের মুখে, যাদের একটা কথাও আমার কানে পৌঁছায় না, যারা পুরানো কথা অনর্গল হাজার বার বলে বলে অতিশয় ক্লান্ত, আর আমিও ক্লান্ত কফি হাউসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা

বেঢক বেমক্কা বসে বসে, পেয়ালার পর পেয়ালা কফি পান ক'রে আর সিগারেটের পর সিগারেট আর মেয়েগুলির সঙ্গে গা-সুড়সুড়ি ইয়ার্কি, রীজের রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেঞ্চিতে বসে থেকে, বকবকানি, নারীদেহের অন্ধকারে সরল উত্তেজনার তরল সন্ধান আমি

"হাই তুলছ কেন? রাত্রে ঘুমোও নি?"

"চুপ ক'রে আছ কেন? কাল যাবে তো কলেজে?"

স্কুলই শেষ হচ্চিল না। শেষ হয়ে কেটে গেল এক যুগ বুড়ো ক'রে দিলে শালা মাস্টাররা। তারপর কলেজ। হাঁ-মুখো, পান-চিবানো পণ্ডিতদের হাতে ধারাবাহিক লাঞ্ছনা। সবার সেরা গদাই লস্কর প্রিন্সি। ছবি দেখে রেগে আগুন! ভাল্‌গার! অবসীন!! ইনডিসেণ্ট!!! ডার্টি! ইউ হ্যাভ্ এ ডার্টি মাইণ্ড! হ্যাঁ, আই ডু হ্যাভ্ অ' ডার্টি মাইণ্ড। আমি নোংরা। তোমরা সত্য, শিব, সুন্দর। শিব হচ্চেন ইনি, এই তিন-তলা চিবুক, আর সত্য প্রিন্সি মোহনসিং সত্যপাল! নোংরা কেবল পৃথিবী নয়, তোমাদের-তৈরি মাদার ইণ্ডিয়া নয়, কেবল আমি

"চুপ ক'রে আছ কেন? হোয়াই ডোণ্টিউ স্পীক?"

আমি তো বলছি। তোমরা শুনতে পাচ্ছ না। তোমরা বলছ, আমি শুনছি না। কোটি কোটি পুরাতন একঘেয়ে বার বার চালানো রেকর্ড লক্ষ কোটি বার বার পুরানো কথার ভাঙা রেকর্ড একসঙ্গে

চুপ ক'রে থাকো, একসময় রেকর্ড থামবে। এখনও, এই মুহূর্তেও, জানালার বাইরে আকাশ, আকাশের পানে উলঙ্গ আবহাওয়ায় হাত-বাড়ানো নতুন নিমগাছ; বাগান পেরিয়ে রেস কোর্স রোড, তার পরে ঘন সবুজ ঘাস আর সারি সারি গাছ, তিনটে রেসের ঘোড়া, একটা হঠাৎ ডাক দিয়ে লাফিয়ে উঠল, ছুট লাগাল, সেই পুরানো ব্যাপার, সেই অনেক আগের অনেক পুরানো ব্যাপার ঘটে ঘটে অনেকবার ঘটেও রোজ লক্ষ কোটি বার ঘটছে আরও কোটি কোটি বার

"কি দেখছ?"

রমণ। ভাগ্যিস মানুষ মিথ্যে বলতে পারে, অথবা চেষ্টা ক'রে চুপ থাকতে পারে। তাই বুঝি পৃথিবী টিকে আছে, মানুষ বেঁচে, তাই বুঝি

"আচ্ছা। তুমি আজ ভেবে দেখো। কাল কলেজে যাবে।"

"হুকুম। কেবল, তুমি জানো না বাবা, পিতা-মহাশয়, একটু লেট হয়ে গেল। হুকুম আর মানব না। অনেক মানুষ একত্র হয়ে ঘোড়ার রমণক্রিয়া দেখছে। মানুষের বেলায় যত লুকোচুরি আর যত রকমের যাবতীয় চুরি আর

"ওকে একবার আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। রত্না ওকে বুঝিয়ে বাগে আনবে। শী ইজ ভেরী ফণ্ড অব্ হিম।"

ভেরী। রত্না আন্টি ভেরী। ভেরী গুড, পিওর, সেন্টলী ভেরী, লুকোচুরি লুকিয়ে লুকিয়ে ভেরী। তুমি বললেই আমি যাবো ভাবছো। যাবো না। যদি বলি কেন যাব না তাহলে রত্না আন্টি ভেরী তোমরা সবাই ভেরী আমি ভেরী ডার্টি

"আজ এসো ডিনার খেতে আমাদের ওখানে। তুমি একাই এসো।"

নো থ্যাংক'উ। তুমি ফিরবে দশটার পর, জিমখানা ক্লাব থেকে। সন্ধ্যে সাতটা থেকে রত্না আন্টি আর আমি। নো থ্যাংক'উ। শী ইজ ভেরী ফণ্ড অব মি।

"আসছো তো?"

"আজ নয়।"

"কেন? আজ নয় কেন?"

শুধু আজ নয়, নয়। কোনও দিন নয়।

"কাজ আছে।"

"কাজ না হাতি। হয় মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়াবে, নয় নোংরা ছবি আঁকবে।"

পুত্রের অধঃপতনে পিতার প্রাচীন আক্ষেপ। না, বাবা, আজ ছবি আঁকবো না। মোহন, রাকেশ, হর্ষ আর আমি গাড়ি নিয়ে বেরুবো।

হর্ষর বাবা গেছে ট্যুরে। একশ মাইল স্পীডে গাড়ি চালাবো। দেখি অ্যাক্সিডেন্ট করা যায় কিনা? গাড়িতে আগুন লাগবে কি? আটকা প'ড়ে পু'ড়ে মরা যাবে কি? যদি দেখতে পাই ও যাচ্ছে রাস্তার ওপর হেঁটে হেঁটে, কোমর নাচিয়ে নাচিয়ে, চাপা দিয়ে পিষে মারলে দারুণ মজা হবে। রাস্তায় এক তাল রক্তের মধ্যে লুটিয়ে থাকবে নরম শাদা শরীর, আমার মার মতো মনে হয়েছিল মুখের আদল, ঠোঁটের হাসি, রক্তে লুটিয়ে পড়বে ন্যাংটো শরীর অনেক রাত জেগে ছবি আঁকবার

"আচ্ছা, আজ না হয়, কাল তুপুরে লাঞ্চ খেতে এসো।"

সভ্যতার মস্ত গুণ সে ছাড়ে না। লেগে থাকে। সভ্য মানুষ আর অসভ্য হ'তে পারে না যতোই সে মারুক আর মরুক। সব কিছু তার সভ্য

"দেখবো"

দেখবো না, যাবো না। কাল, আজকের পরে কাল অনেক দূরে, কালের পর, আবার কাল, আবার, আবার, আবার। ব্লাডি এণ্ডলেস্ টাইম। এখন বিকেল শেষ হয়ে আসছে, এখুনি সন্ধ্যা নামবে। হর্ষ আসবে গাড়ি নিয়ে, নতুন ফিয়াট; তুলবো রাকেশ আর মোহনকে। তারপর তারপর তারপর হতে-হতে-কিছু-না-হতে-না-হতে রাত্রি গভীর হবে, বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়বে, সকলে ঘুমকে চুমু খাবে, আমি আঁকবো, ডার্টি ছবি, ঘোড়ার রমণের ছবি নিয়ে হাজির হব প্রিন্সি মোহন সিং সত্যপালের সামনে, রেগে ফেটে পড়বে আর চিকচিক চোখ বার বার চুরি-তাকাবে ছবির দিকে, বাবা আর এই দশজনের-একজন বেশি মদ্যপান করবে, মার স্যাঁতসেঁতে চোখে আরও ঝরবে জল, আহা ঝরনা, আর তুমি, হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি, তুমি, যদি সত্যি গাড়ির চাকায় চ্যাপ্টা-ন্যাংটো হয়ে না গিয়ে থাকো, একদিন ছবি দেখে ঠোঁট বাঁকিয়ে, ভ্রূ তুলে শব্দ করবে হুঁম্, হুঁমমম্, হুঁম্ম্ম্ম্ম্, হিংসায় তোমার চোখ জ্বলবে।

অনেক রকম অনেক শব্দ করতে তুমি, হুঁঙ্ ? অনেক রকম অনেক কিছু অনেক রকম

বাবা থকে গেছেন। দু গালের গর্তে বিষাদ। দু চোখের কোটরে বিবর্ণ মেঘ। বেঁচে থাকবার দাম। চড়া মাশুল। আমার করুণা হচ্ছে না। বিওয়েয়ার অব্ পিটি। করুণা করো তো মরবে। সবকিছু গ্রীষ্মকালের বরফের মতো গলে যাবে। বিগলিতকরুণা-জাহ্নবীযমুনা-বিগলিতজীবনেরদুর্গন্ধনমুনা। করুণা করবো তো চলে যাব কলেজে, গলায় গামছা দিয়ে দাঁড়াব প্রিন্সি সত্যপালের সামনে, কবুল করব 'ডার্টি' ছবি আর আঁকবো না, পড়ব যা চাইনে, পারিনে, ঘেন্না ক'রে, পারিনে, চাইনে পড়তে ; বসব পরীক্ষায় পাস করব কে না পাস করে, করুণায় আই. এ. এস. ইন্তিহান দেব, হতচ্ছাড়াদের ওপর গুলি চালাবার হুকুম দেব ফাইল বগলে জয়েন্ট সেক্রেটারীর ঘরে তিন হাজার বার রোজ দৌড়াব আর ভারত-ইতিহাসের মতো লম্বা সার্থক শাশ্বত শুভ্র জীবনে, কি দারুণ ব্যাপার ব্ল্যাডি বল্‌স্

টেলিফোন বাজলে এ বাড়িতে তখুনি ধরবার নিয়ম নেই। বাবা কখনও ধরে না, মা তো ধরতে পারেই না, অডারলি হেলেদুলে এগিয়ে আসবার আগেই অনেকবার আমি ফোন ধরে ফেলি এবং এমনি ফোন ধরতে গিয়েই তো প্রথম টের পেলাম বাবা কার সঙ্গে কারবার চালাচ্ছে, আমার আর বাবার গলার স্বর একেবারে হুবহু এক, অর্থাৎ আমি ওনারই ঔরসজাত সুকুমার-সন্তান, তাই অনেকের মতো ভুল ক'রে মেয়েমানুষটা 'হ্যালো' শুনেই একেবারে ম'রে যাচ্ছিল, বুঝি জ্বালায়, জ্বালায় বলে ফেলল 'কাল সন্ধ্যায় এলে না যে, ডারলিং', আমি তক্ষুনি চিনে নিলাম তিনি কিনি, একবার কারুর গলার স্বর শুনলে আমার ভুল হয় না, আর লোকে জানেও না টেলিফোনে গলা কি ভাবে নিজেকে ধরা দেয়, চিনে ফেললাম, মাথাটা মুহূর্তের জন্যে গরম হয়ে উঠল, তারপরে হাসলাম, নিশ্চয় হাসলাম, বললাম, 'দুঃখিত, অনেকক্ষণ

অপেক্ষা করছিলে? বেহায়া-গরম জবাব এলো, 'কি নিষ্ঠুরের মতো কথা বলো তুমি মাঝে মাঝে,' আর আমি বললাম, 'মাপ করবেন, আপনি বুঝি আমার বাবাকে চান, ডেকে দিচ্ছি,' আর ওস্তাদ চালাক ব্লাডি বীচ্, তক্ষুনি জিভ-কাটল, 'এটা কি সিক্স ডব্‌ল্ ওয়ান টু সিক্স ওয়ান?' হেসে বললুম, অন্ সেকেণ্ড থট, রং নাম্বার, তার কাটল, সেই পুরানো অনেক কালের সব কালের আগের কালের পুরানো যার শেষ নেই

অতএব। আমরা মেয়েদের সঙ্গে মিশলে এঁদের ঠোঁট টাটায়, বুক টনটন করে, মেজাজ চড়ে যায়, যতো সব জোচ্চোর ন্যাকার দল, যতো সব তলেতলেতলিয়ে-খাবার দল, এক একটি ন্যায়-সত্য-শিব-সুন্দরের মুখোশ পরে বসে আছে, মুখে ভালো আঁটছে না তাও জানে না, লজিকের মাস্টার গোরা মিত্রের মতো, চুলে কল্‌প দিতে গিয়ে গোঁফের শাদা ঢাকতে ভুলে যায়, এরা সবাই একরকম, যতো শাসন উপদেশ ন্যায় নীতি অন্যের বেলা, ছোটদের বেলা, কারণ ছোটরা বড়ো হয় আর এরা হয় বুড়ো, ছোটরা যা পায় তাতে এদের মৃত্যুহীন লোভ, ছোটদের বড়ো হওয়া দেখে এদের প্রাণ যায় শুকিয়ে

"হ্যালো। হর্ষ! হ্যাই! তোর জন্যে বসে আছি, ইয়ার! এক্ষুনি চলে আয়। পেট্রোল ভরা নেই? রাস্তায় ভ'রে নিস। না ইয়ার, ট্যাংক ফুল। টাকা? তুই পেট্রোলের দাম দিয়ে দে, ইয়ার, বাকী খরচ আমার। তোমার পয়সা নেই, বাবা! বল্‌স্। ড্যাম্‌ম্ ইয়র ফাদার, ড্যাম অল ফাদার্স। দুনিয়ার পুত্রকন্যারা এক হও। হ্যাঁ ইয়ার, অনেক লেকচার শুনতে হ'ল। নট্ ওনলি হি, উনিও ছিলেন। কাকুল্ড। হাসছিস্ কেন ইয়ার, কে কাকুল্ড আর কে নয়, বোঝা মুশকিল। আই ওন্ট রুল আউট এনি ওয়ান। দ্যাটস্ রাইট্। সত্যি? কবে, কাল? কাল রাত্রে? হাউ ডিড্ ইট গো? আমার ভালো লাগে না। সিনেমায় বসে প্রেম ভালো লাগে না। সত্যি বলছি।

আই হেট এনিথিং স্যুপারফিসিয়াল। হাসছিস যে? ওয়েস্ট্ অব ভাইটালিটি। ডিসিপেশন। দ্যাট বীচ্। কি বলল? হা-হা-হা-হা-হা-হা। দাঁড়া ইয়ার, হেসে নি, বড্ড হাসি পাচ্ছে হা-হা-হা-হা-হা-হা তুই বোকা বনে গেলি তো? হা হা হা হা ক্লেভার বীচ্ হা হা হা হা ঘেমে উঠলি? হা হা হা হা হা হা হা হা হা হা তুই এত ক্যাবলা-কান্ত ইয়ার হা হা হা অ্যাঁ কি বললি? ওরে বাবা হা হা হা হা দারুণ দেখছি হা হা হা হা দ্যাটস্ অ ভেরী গুড ওয়ান, না ছাড়িস নে, হা হা হা হা আমি? নেভার। কলেজে আর নয়। বলছে প্রিন্সির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই হবে। না ইয়ার, ও-নাম আর নয়। কেন? নিশ্চয়। দেখবি, ইয়ার, একদিন কি ছবিটাই না আঁকবো। হ্যাঁ হ্যাঁ ডার্টি। বলতে দে, ইয়ার, লেট দেম গ্যাস টু দেয়র অ্যাসেস্ কনটেণ্ট। হা হা হা। সেক্স ইজ নট্ ডার্টি, নট্, নট, নট, ডার্টি। আমাদের মন নোংরা। দেহ সুন্দর, কুৎসিত হলেও সুন্দর। জানিস, ইয়ার, কাল একটা কথা মনে হ'ল: প্রোফাউণ্ট থট। নোট বই-এ লিখে রাখ ইয়ার, কাজে লাগতে পারে। বলবো! মানুষের যদি মন না থাকতো তাহলে কোনও সমস্যা থাকত না।' লেট দেয়র বি অ ক্রুজেড্ এগেইনস্ট্ দ' মাইণ্ড। না, না, ইয়ার, রবোট নয়। রবোট ছবি আঁকবে কি ক'রে? কিসের ক্রুজেড? কেন? দ' ডার্টি হিউম্যান মাইণ্ড হ্যাস্ টু বি ক্লী—ই—ন্ড্। হাউ টু! বলছি, ইয়ার, শোন্। না, না, ছবি এঁকে নয়, ছবি কজন আঁকে? আঁকতে হলে অবশ্য হাতে তুলিই উঠবে না মন নোংরা থাকলে, অ্যাঁ, কি বলছিস্? নিশ্চয়। একশ' বার। অল্ মাই সেক্স পেইন্টিংস্ আর অ্যাবসলিউটলি ক্লীন। গঙ্গার চেয়েও পবিত্র। একশ' বার। নিশ্চয়। তুই যে ছবিটার কথা বলছিস ওটা তো সবচেয়ে পবিত্র, বলতে পারিস, উসমে গঙ্গা বহতী হ্যায়, একেবারে না, আঁকবার সময় আমার একটুও সেক্স ফিলিং ছিল না। সত্যি বলছি। না, মডেল কোথা পাবো—হা হা হা হা

মডেল পেলে বেড়ে হত ? না, বাস্টার্ড, সে মডেল আর কোথায় ? না, অনেকদিন দেখি নি। দেখতে চাইও না। না, ইয়ার, সত্যি। তুই আসছিস বল ? জলদি চলে আয়। হোয়াট ? তাড়াতাড়ি চলে আয়।"

নো, আই ডিড নট ফীল। আমার কিছু অন্য অনুভূতি ছিল না। রঙ আর তুলি আর ক্যানভাস আর পুরুষ আর নারী আর আমার সবটুকু কি-যেন-বলে। আর পাগলা ঝড় আর উন্মত্ত বেতাল পৃথিবী আর পাতাল-আঁধার ধারাল জীবন। পুরুষ ও নারীর দৈহিক মিলন নিয়ে ছবি আঁকলে কলেজ থেকে তাড়া খেয়ে পড়া ছাড়তে হ'ল, পড়ায় আমার মন নেই, ভালো লাগে না। শালা হর্ষ আধঘন্টা কাটিয়ে দিল টেলিফোনে বকবক ক'রে, গাড়ি নিয়ে আসবে কখন কে জানে ?

ইতিমধ্যে কিছু টাকা চাই মা জননী। মানুষের সঙ্গে বিধাতার চরম রসিকতা : মুদ্রা। মুদ্রা আবিষ্কার ক'রে মানুষ সবকিছুর, নিজেরও, মূল্য যাচাই-এর সহজ ও শেষ উপায় খুঁজে পেল। একথা পরম সত্য যে ছবি আঁকতে টাকা লাগে, ছবি বিক্রি ক'রে টাকা পাওয়া যায় না। অতএব ছবি আঁকা যায় না বিনা টাকায়। একটা সন্ধ্যা এন্‌জয় করা যায় না বিনা টাকায়। পেট্রোল কিনে হর্ষ বিমর্ষ হবে, পকেট ফাঁক। সাধুও হওয়া যায় না বিনা টাকায়। রাকেশকে ঝাড়লেও দশটাকা বেরুবে না।

শেষ অবধি সেই ঘর। চাইনে, চাইনে, চাইনে ঢুকতে ও-ঘরে। যতক্ষণ বাড়ি থাকি এড়িয়ে চলতে চাই ও-ঘরটা। ও-ঘরে টাটকা তাজা বাসি ফুলের গন্ধ, চন্দন-ধূপের গন্ধ, ম্যাক্স-ফ্যাটকর প্রসাধনের গন্ধ, বিদেশী সেন্টের গন্ধ, নোটিশ লাগিয়ে প্রতিদিন এগিয়ে-আসা মৃত্যুর সৌরভ।

আমি চাইনে ও-চোখ আমার দিকে তাকাক। আমি চাইনে দেখতে এই শীর্ণ অসহায় ক্লান্ত নালিশ, ঠোঁটের প্রান্তে মুমূর্ষু হাসির মুখোশে হঠাৎ উধাও।

"ও, তুমি ? তুমি আছো বাড়িতে এখন ?"

না নেই

"কদিন পরে এ ঘরে এলে জানো ?"

জানি না

"মাকে কি মনেও পড়ে না একবার ?"

না পড়ে না। না। নানানানানা—আ

"আয়, বোস এসে আমার কাছে। এখানটায় আয়।"

না

"আয় না !"

না

"এত দূরে বসলি কেন ? কাছে আয়।"

আসবো না আসবো না না না না কিছুতেই আসবো না তুমি মরবে এই কদিন কমাস পরেই তুমি মরবে তোমার কাছে আমি আসবো না তোমার দেহে মৃত্যু কিলবিল করছে আমি আসব

"না।"

"ভয় করে আমার কাছে আসতে তোর ?"

করে

"না।"

"তবে আসিস না কেন ? বলবি না ? আমি জানি"

"না।"

"কি না ?"

জান না তোমরা কেউ কিচ্ছু কোনও কিচ্ছু একেবারে কিচ্ছু জান না তোমরা সবাই অন্ধ বোকা নিজেদের ঠকিয়ে ভাবছ দুনিয়া ঠকল তোমরা কেউ কিচ্ছু জান না জানলেও জান না যে জান তোমরা কেউ কিচ্ছু

"কিছু না।"

"তুই নাকি কলেজ ছেড়ে দিয়েছিস ?"

"তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"ওসব নোংরা ছবি কলেজে না দেখালে হত না?"

"ওরা ছবি চেয়েছিল।"

"অন্য ছবি ছিল না?"

"না।"

আই গেভ্ মাই বেস্ট। দোজ্ এস-ও-বি'স

"কলেজ ছেড়ে কি করবি?"

কিছু না কেবল

"ছবি আঁকব।"

"মানুষ হ'তে হবে না?"

না মানুষ হতে হবে না না মানুষ কেউ হয় না কেউ মানুষ না হতে হবে না

"বাবাকে এত কষ্ট দিচ্ছিস কেন?"

কে কাকে কষ্ট না দেয় তুমি বলতে পারো? বাবা তোমাকে এত কষ্ট দিচ্ছে কেন, তুমি কেন বাবাকে সারা জীবন কষ্ট দিলে? কি মজার আবদার! বেঁচেও থাকব, কষ্টও দেব না, পাবও না। যে যতো কাছের মানুষ সে ততো মারে, মার খায়। তুমি আমায় মারছ কেন এমনি ক'রে, কেন মারছি তোমায় আমি তোমার ছেলে যাকে জন্ম দিতে তুমি কষ্টে প্রায় মরে গিয়েছিলে, জন্মাবার যন্ত্রণায় যে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিল, যাকে তুমি বুকে চেপে চেপে কেবল কষ্ট দিয়েছ, যে তোমায় কষ্ট দিয়েছে দেবে দিচ্ছে আরও দেবে কেননা তুমি বাঁচতে পারলে না, তুমি মরছ, তুমি বেঁচে থাকলে না কেন কি দরকার ছিল তোমার মরবার তুমি তোমার শরীরে মৃত্যুর সাপ-সাপ গন্ধ

"উঠলি যে?"

"হর্ষ আসবে গাড়ি নিয়ে।"

"হুল্লোড় করতে বেরুবি বুঝি?"

"কিছু টাকা দাও না।"

"টাকা! আমার কাছে তোর কেবল একটি দরকার। টাকা। কেন, টাকা কেন?"

"পকেট সাফ্।"

"গত মাসে তো দুশো টাকা নিয়েছিস।"

"ফুরিয়ে গেছে।"

"কি করেছিস?"

"মনে নেই। রঙ"

"রঙ কিনতে আর টাকা দেব না। ছবি আঁকা তোর সর্বনাশ করল।"

দেবে তুমি জানি না দিয়ে পারবে না তুমি দেবার জন্যে সারা জীবন তৈরি ব্যগ্র কাতর হয়ে রইলে বৃষ্টি কি পারে জল না দিয়ে এখন তোমার দেবার সময় আর বেশি নেই তুমি দেবে না দিয়ে তোমার উপায় নেই তুমি

"চললি যে! রাগ হয়ে গেল!"

যেমন সবাই সবাইকে সব সময় অনায়াসে ঠকায় তেমনি তোমাকে

"কতো চাই।"

"একশ'।"

"ব্যাগে আছে। নিয়ে যা। শোন। চলে যাস না। একটু বোস এসে কাছে আমার। তোকে তো দেখতেই পাই নে। তাড়া কিসের? কোথায় যাচ্ছিস? গাড়ি কে চালাবে? তুই চালাস নে। চালালেও আস্তে চালাস। বড় ভয় তোকে নিয়ে। মানুষ"

মানুষ দেখে দেখে পচে গেলাম। মানুষ হয়ে কাজ নেই আর। তার চেয়ে

"তোর আন্টি ফোন করেছিল। তোকে যেতে বলেছে।"

আন্টি না হাতি বাবার বন্ধুর স্ত্রী আন্টি

"কাল যাস একবার। তোকে খুব ভালোবাসে"

দারুণ। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। অসহ্য লাগে। মাথায় খুন চেপে যায়। মুখোশ, দেখতে বেশ। দারুণ অন্ধকার। সব কিছু, সবাই ন্যাংটো। মুখোশ পরে মুখোমুখি বসে আছে, দুনিয়া চলছে আরামে, সত্য, শিব, সুন্দর। আন্টি। দশ-জনের-এক-জনের বৌ। পূজা, গীতাপাঠ, রামকৃষ্ণমিশন, তীর্থযাত্রা, মুখোশ। যা জানি তোমরা তা' জান না। মানুষ হওয়া বুঝি সহজ? সহজ বুঝি বড় হয়ে ওঠা? কঠিন জঘন্য কুৎসিত। বড় হ'তে হ'তে বড়দের অনেক কিছু দেখে ফেললাম আর বড়রা হয়ে গেল অনেক অনেক ছোট আর ছোটরা হ'তে পারল না বড়। তুমিই তো পাঠিয়েছিলে আংকল্ ট্যুরে গেলে, আন্টির বাড়িতে ঘুমুতে আর আন্টি আমায় খুব ভালোবেসেছিল এখনও একা পেলেই আবার খুব ভালোবাসবে পূজা গীতাপাঠ তীর্থযাত্রা রামকৃষ্ণ-মিশন ভালোবাসা

"হ্যালো! কে? ও ইউ বাস্টার্ড। আরে, ইয়ার, পনের মিনিট হয়ে গেল হর্ষ ফোন করেছিল। এখনও ছ্যাট পিগ্ গাড়ি নিয়ে আসছে! শোন্, রাকেশ, তুই বেরিয়ে যাস না যেন। হর্ষ আসবে এখুনি। আমরা আসছি। কে? ওয়াপ!! সত্যি বলছিস! খুব ভালো হবে। না, অনেকদিন দেখি নি। বাজে বকিস নে, সী ইজ্ নট মাই এনিথিং। না ইয়ার, কোনো মতলব আমার নেই; আমরা ফিরেও তাকাবো না। প্রমিজ। কি বললি? দিস্ ব্লাডি লাইন! খটখট আওয়াজ হচ্ছে কেন রে? কেউ ট্যাপ্ করছে না কি ফোন? কি বললি? কোথায়? কবে? পরশু বিকেলে? না, কিছু নয়। গলাটা খুসখুস করছে। কোথায় পার্টি ছিল? হোমাদের বাড়ি? কি বললি? না কিছু না, গলাটা কেমন করছে। মাই গড্। সী ওয়াজ হোয়াট? ড্রাঙ্ক? গড্ অলমাইটি! সত্যি বলছিস্?

হর্ষ এসে গেছে। গাড়ির হর্ন। এবার পালাব গহ্বর থেকে, কি প্রকাণ্ড গহ্বর, কি কালো কি কুৎসিত, তবু এখনও আছে রাস্তা, রাস্তায়

মুক্তি। সারা ছুনিয়াটা কেন হ'ল না শুধু পথ, পথ, পথ। বাড়ি নেই ঘর নেই শহর নেই বন্দর নেই ফ্রন্টিয়ার নেই, মানুষ কোথাও দাঁড়াবে না, চলবে, চলবে, দিল্লী থেকে পথ চলবে প্যারিস, লণ্ডন, হেলিসিঙ্কি, আবার পথ চলবে, লেনিনগ্রাড, ব্লাডিভস্টক, আলাস্কা, মিয়ামি, বুনস্ আয়ার্স, অকল্যাণ্ড। জিওগ্রাফিটা ঠিক হচ্চে না। এমন কেন হ'ল না যে পৃথিবীর জিওগ্রাফি নেই, মানুষের ইতিহাস নেই, অতীত-বর্তমান ভবিষ্যৎ নেই। এমন কেন হ'ল না যে মানুষের স্মৃতি নেই, কিছুই মনে পড়ে না, কাউকে না, কোনো ঘটনাকে না, কখনও কাউকে কোনও কিছুকে না। কি সুন্দর লেগেছিল প্রথম দেখে, মাইরি। কোঁকড়া কোঁকড়া বব ছাঁট চুল, টাইট্ সালোয়ার-কামিজে দেহ ফেটে বেরিয়ে আসছে। মা বলল আমার ছেলে এবার আঠার শেষ হ'য়ে উনিশ, তোমার চেয়ে বছর আটেকের ছোট। আমার কেমন চাইতে লজ্জা করছিল, চাইলাম তো চোখ পড়ল বুকের ওপর, গা ঘেমে উঠল। মা বলল, ছবি আঁকে। বলে উঠল, তাই নাকি? দেখতে হবে তো! মা বলল, তোর মাসি, আমার বোন, তোকে দেখাশোনা করবে, আমি তো কিছুই করতে পারি না তাই ওকে কিছুদিন কাটাতে বলেছি এখানে তোর মাসি কেন যে মানুষের এত কিছু মনে পড়ে কেন যে

"এত দেরি হ'ল যে তোর! ভাবলাম বুঝি এলিই না।"

"হঠাৎ মা বললে দোকানে যেতে।"

"পেট্রোল নিয়েছিস?"

"ট্যাংক ফুল। টাকা নিয়েছিস?"

"কিছু।"

"চলে আয়।"

"এক মিনিট ইয়ার। জামাটা বদলে আসছি।"

মাথার মধ্যে পোকাগুলি কেবল কিলবিল করছিল। দরজা বন্ধ ক'রে ছবি আঁকছিলাম। কতো পোকা কতো রঙ ধরল টেরও পাই নি।

দরজায় টক টক। দরজায় ধাক্কা। এত রাত্রে কি করছ? কিচ্ছু না। দিদি তোমায় শুতে বলছে। দেরি আছে। কি করছো? কিচ্ছু না। দিদি তোমায়। তুমি মার কে হও? বোন। কি রকম বোন! এতদিন তোমায় দেখি নি কেন? এখন কেন এসেছ? বাঃ আসবো না। হঠাৎ দেখলাম। আবার দেখলাম। ড্রেসিং গাউনের আড়ালে নয়। ছবি আঁকছ? না। দেখি, দেখি, তোমার ছবি। না। কি দেখছ? তোমার ছবি। কিছু বলছো না কেন? কার কাছে শিখেছো? কারুর কাছে নয়। তুলিটা কোথায়? কেন, কি করবে? দাও না তুলিটা। এমনি ক'রে, এখানটা এমনি ক'রে, বুঝলে? না। অমনি ক'রে নয়। আমি জানি তোমার অনেক নাম। তোমার ছবির অনেক নাম, অনেক দাম। কিন্তু এ ছবি আমার, এ ছবি-আঁকা আমার, আমি কারুর কাছে শিখি নি, শিখব না। ছবি-আঁকা আমায় শেখাতে এসো না। তুমি আঁকতে জানো না। না শিখলে কোনওদিন আঁকতে পারবে না। আলবৎ পারবো। আর কিছু পারব না, এটা পারব। কারুর কাছে শিখবো না। তুমি যাও। ছবি আঁকার সময় আমার ঘরে কেউ আসে না। আসলে কি করো? রেগে যাই। রাগলে আমার মেজাজ বড় খারাপ। তুমি যাও। আচ্ছা যাচ্ছি। বেশি রাত জেগো না। তোমাকে দেখা-শোনার ভার আমার, আমার ভার অনেক কঠিন তুমি তা জান না তুমি কিচ্ছু জান না

"এ শার্টটা কোথায় পেলি ইয়ার?"

"কিনেছি। আর, কোথা পাবো?"

"কত দাম রে?"

"ভুলে গেছি। আমি চালাই?"

"প্রথম আমি।"

"চল। রাকেশকে তুলতে হবে আগে। তারপর হোমা ভাণ্ডারী।"

"ওয়াও।"

মার মতোই দেখতে অনেকটা। মা যদি রোগা পটকা পাংশুটে না হত, মার গা যদি এমন নরম সুন্দর হত, আমি কি মাকে এত দূরে দূরে রাখতাম ? মার মতো মুখের গড়ন, হাসির ধরন, গালে টোল, গলায় ভাঁজ মার মতো গলার স্বর। মার মতন সরু সরু সাদা আঙুল মাথায় কপালে লাগল, তখন আমার জ্বর। মার মতন নরম মিষ্টি দেহ আমার গায়ে লাগল তখন আমার জ্বর। মার মতন হাত বুলাল পুড়ে যাওয়া কপালে তখন আমার জ্বর। মার মতন

"চুপ ক'রে আছিস কেন ?"

"কৈ ?"

"এত ভাবিস কি তুই, ইয়ার ?"

"কৈ ?"

"হোমা যাবে আমাদের সঙ্গে ?"

"হুঁম।"

"লাকি বাগার রাকেশ। না ?"

"উঁ।"

"লাকি বাগার।"

"হুঁম।"

"এই ব্লাডি ফুল !"

"হোয়াট ?"

"দেখছিস না ? এক্ষুনি চাপা পড়ছিল। বাস্টার্ড।"

"চাপা"

মার মতো মনে হয়েছিল। জ্বরের পরে ঝড় আর কি দারুণ নিদারুণ নেশা, মায়ের নেশা। মার মতোই তারপর একদিন আবার অনেক রাত্রে ঘরে এসেছিল। মার মতোই মার মতোই মনে হয়েছিল সমুদ্র সবগুলি ঢেউ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সূর্য সব তাপ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, পৃথিবী থর থর প্রথম প্রথম। মার মতোই কাছে টেনে

নিয়েছিল। তারপর গলা টিপে সন্তানকে হত্যা। আমার চোখের সামনে নয়কোটি রডডেনড্রন একসঙ্গে জ্বলে উঠল আর আমাকে মেরে ফেলতে ফেলতে বার বার জ্বলে উঠে বলেছিল, ইউ লুক লাইক অ' নেকেড ক্রাইস্ট। আমি বলেছিলাম ইউ লুক লাইক

"এই শালা, ইয়ার, একে গাড়ি চালানো বলে? তার চেয়ে ঠেলা গাড়ি চালাস নে কেন? ব্লাডি বাস্টার্ড। দে, দে, আমাকে দে। যা, স'রে বোস

বলেছিল ইউ লুক লাইক অ' নেকেড ক্রাইস্ট্, আমি বলেছিলাম তোমাকে দেখাচ্ছে, তুমি, তোমাকে

"না না, মরবি না। ভয় পাচ্ছিস কেন?"

বিউটিফুল ডার্টি ছবি। জীবনটা শালা এত ডার্টি যে ছবি না এঁকে রেহাই নেই। দ' অনলি রিফিউজ। বুঝলি? বুঝলি না? পরশু হোমাদের বাড়ি পার্টিতে সী ওয়াজ ড্রাঙ্ক! না, ইডিয়ট, হোমা নয়, সী—ই-ই-ই। সী ওয়াজ ড্রাঙ্ক। আমার নাম বলছিল বার বার। ডার্টি বীচ। মায়ের মতো মনে হয়েছিল। হা হা হা। অনেক আগুন জ্বলেছিল জানিস। অনেক ছবি। মডেল পেয়েছিলাম। বাবা-মা ক্ষেপে গিয়েছিল। ছেলের সতীত্ব বাঁচাবার জন্যে বাড়ি থেকে বার ক'রে দিল। নরকে আরও আগুন লাগল। আমিও গেলাম বেরিয়ে। ছবি ছবি ছবি আগুন আগুন আগুন

"দাঁড়া না! মাত্র তো আশি মাইল।"

সব আগুন একদিন নিবল। রূপ হ'ল দাপট, প্রেম হ'ল শাসন। হুকুম, আমার কাছে ছবি আঁকা শেখ। ছবি আঁকা কারুর কাছে আমি শিখব না। আঁকতে তুমি জানো না। কি বললে? তোমার আঁকা শেষ হয়ে গেছে। আমার সবে শুরু। কি বললে? তুমি এখন একই ছবি বার বার আঁকছ? কি বললে? তুমি এখন আমায় নকল করছ। গালটা পুড়ে গেল। দারুণ লেগেছিল মাইরী। উল্টে

আমিও চড় বসিয়েছিলাম নরম গালে। ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরল লাল টুকটুকে আসল রক্ত

"তুই যা। রাকেশকে ডেকে আন।"

"তুই-ও আয় না।"

"আমি বসছি।

পরশু হোমা ভাণ্ডারীদের পার্টিতে সী ওয়াজ ড্রাঙ্ক। মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে চীৎকার করেছে, কাম, ডু হোয়াটাভার···তারপর বমি।

হা হা হা হা হা

"কিরে একা একা হাসছিস যে?"

"হাসবো না আমি কে জানিস?

"তুই—

"আই অ্যাম্ অ' নেকেড্ ক্রাইস্ট।"

"নেকেড হোয়াট?"

"অন্তত একদিন ছিলাম। বলেছিল, জানিস, বলেছিল

সেই বার্ধক্য চাই

[এ নাটক একটি অভগ্ন বিলম্বিত বাক্যের মতো অভিনীত হবে। এর চরিত্রগুলি বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে সচল-সজীব হলেও, প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র সংঘাতকে একটিমাত্র বাক্যে সোচ্চারিত করছে, নাটকের পরিচালককে খেয়াল রাখতে হবে। চরিত্রগুলি যখন কথা বলবে, নিজের সঙ্গে বললে না, বলবে দর্শকদের সঙ্গে, টেলিফোনে কথা বলার সময় একসঙ্গে অদৃশ্য দ্বিতীয় ব্যক্তি এবং দর্শকের সঙ্গে, নিজেদের মধ্যে যখন কথা বলবে, তখনও দর্শকগণ বাক্যালাপের লক্ষ্য বলে পরিগণিত হবে, অর্থাৎ নাটকের সমস্ত কথার মধ্যেই দর্শকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে, পরিচালককে একথাও স্মরণ রাখতে হবে। আলো-অন্ধকারের চতুর ব্যবহারে নাটকের স্থান-কাল পারিপার্শ্বিকের বৈচিত্র্য এবং ব্যাপকতা ফুটিয়ে তুলতে হবে; ফ্ল্যাশব্যাকের সময়েও আলো-আঁধারের কুশল প্রয়োগ অভিনেতাদের বেশবাস ও বয়সের তারতম্য দর্শকদের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রাখতে সাহায্য করবে। যখন যে চরিত্র অভিনয় করবে আলো পড়বে একমাত্র তারই ওপর, বাকি মঞ্চ অন্ধকার থাকবে। অভিনয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত যন্ত্রসংগীতের ব্যবস্থা থাকবে, বাক্যের যতিগুলি, অর্থাৎ নীরবতাগুলি, যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে রূপায়িত হতে পারবে। পরিচালককে বুঝতে হবে নীরবতা কথোপকথনের বিশিষ্ট উপাদান, বিশেষ ক'রে এ নাটকে এবং একটা গোটা মানুষের চেয়ে, অনেক সময়, তার এক বা দুটি অঙ্গ, যেমন হাত, অথবা চোখ, অথবা পা, অনেক বেশি বক্তিত্ব এবং সংঘাতের ব্যঞ্জনা দিতে সক্ষম।

মঞ্চ তিন ভাগে বিভক্ত, কিন্তু তিনের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন সংমিল বর্তমান। মঞ্চের মাঝখানে টেবিল, চেয়ার, দেওয়ালের ছবি, ক্যালেণ্ডার ইত্যাদির ব্যবহারে দেখাতে হবে এটা জীবনে চলতি ভাষায় যাকে সার্থক পুরুষ বলা হয় এমন একজনের আপিস ঘরের একাংশ। টেবিলে টেলিফোন থাকবে। ডানদিকে একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের মহিলার শয়নঘর, যার অংশ দেখালেই চলবে, কিন্তু তাতে একটা পালঙ্ক অবশ্যই থাকবে, পাশে গা এলিয়ে বসা যায় এমন একখানা চেয়ার। এবং কোণের টেবিলে টেলিফোন। মঞ্চের আয়তন বুঝে অন্য আসবাব, দেওয়ালে ছবি, বিছানার পাশেছোট টেবিলে বিজলি বাতি, ফুল ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। মঞ্চের বাঁ দিকটা বড় একটা পার্কের একাংশ, একটা বেঞ্চি পাতা তো থাকবেই, পাশে একটা গাছ রাখতে পারলে ভাল। বেঞ্চির চতুর্দিকে ঘন সবুজ ঘাস, দূরে লেকের জল দেখা যাচ্ছে।

পর্দা ওঠবার পরেও আধ কিংবা এক মিনিট মঞ্চ অন্ধকার থাকবে। বার বার আলো পড়বে মঞ্চের মধ্যম অংশে, সেখানে দেশনেতা সূর্যপ্রতিম চৌধুরী টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসে একটা নকশা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করছেন। আলো পড়বে প্রথমে সূর্য-প্রতিমের পায়ে, তিনি পা নেড়ে চলেছেন, তারপর টেবিলে, তারপর তাঁর সর্বাঙ্গে। সূর্যপ্রতিমের বয়স চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশের মধ্যে, মাথায় একঝাঁক চুল, সবে মাত্র পাক ধরেছে, চোখে চশমা, পরনে ধুতি এবং গেরুয়া রংএর খদ্দরের কুর্তা, উত্তর প্রদেশী কায়দায় তৈরি। সূর্যপ্রতিম সার্থক পুরুষ, সার্থকতা আত্মতুষ্টি ও উচ্চাশার অসন্তোষ যুগপৎ তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করেছে, দুটোই এক সঙ্গে তাঁর কথাবার্তায়, চলন-চালনে, ব্যক্তিত্বে সুপরিস্ফুট। পুরুষটার মধ্যে যে ডাইনামিজম যথেষ্ট, তার প্রকাশ পাবে কণ্ঠস্বরের উচ্চতায় এবং আকুলতায়।

সূর্যপ্রকাশকে দর্শকদের কাছে প্রতিভাত ক'রেই মঞ্চ আবার পূর্ণ অন্ধকার। এবার মঞ্চের ব্যাকগ্রাউণ্ড পর্দায় একটা বিরাট ছবি পড়বে : ছবিতে একটা বছর আঠারর ছেলে দৌড়ে পালাতে পালাতে একজন অদৃশ্য মানুষের হাতে গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে আছে। ছবিটা মিনিট দুই দেখাবার পর আলো পড়বে আবার সূর্যপ্রতিমের ওপর। তিনি তখনও নকশাটা নিবিষ্টভাবে দেখছেন। হঠাৎ অতি সহজভাবে মুখ তুলে দর্শকদের বলবেন :]

সূর্যপ্রতিম। ঐ খুনটা আমি করেছিলাম। বছর তিনেক আগে। জীবনে দাঁড়াতে গেলে, বুঝলেন না, বড় হতে গেলে অমন খুনটুন করতে হয়। সবাই করে।

[হঠাৎ গলা চড়িয়ে] আপনারা করেন না, করেন নি ? আপনি ? আপনি ? ঐ যে ওখানে আপনাকে দেখে তো বেশ সার্থক পুরুষ নমে হচ্ছে, নিশ্চয় আপনি বর্তমান অথবা ভূতপূর্ব মন্ত্রী, অথবা অন্তত ডাকসাইটে ডাক্তার, নয় বারোহাত ব্যারিস্টার আপনি করেন নি খুন কখনও কাউকে ?

লোকটা, লোক বললে ভুল হবে, ছেলেটা, আমার পেছনে লেগেছিল। ভাল ছেলে, ভদ্র ঘরের ছেলে, দেখতে শুনতে বেশ, বুদ্ধিমান, চৌখস। টানা টানা চোখ, ভাবালু, যেন সব সময় স্বপ্ন দেখছে। ওতেই আমার ভাল লেগে গিয়েছিল ছেলেটাকে, ঐ সব-সময় স্বপ্ন-দেখা চোখের জন্যে, হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, আমিও একদা অনেক কাল আগে, অন্যদিনে, আর এক পৃথিবীতে ওরই মতো বোধহয় ছিলাম, বোধহয় ; এখন আর ঠিক মনে নেই, স্মৃতিচারণকে আমি দারুণ সন্দেহ করি, আসলে আমাদের, অর্থাৎ মানুষদের মন নামক যন্ত্রটি একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়, অসঙ্গতি, অসঙ্গত, ইত্যাদি সমস্যা-মূলক পদার্থে ভরা, ওটা না থাকলে আমাদের অনেক সুবিধে হত, অন্তত সমস্যা কমে যেত

অনেক, আর তা ছাড়া ওটা, মানে মনটা, থাকেও না, একটু একটু ক'রে মরে যায়, অন্তত বদলে অন্য রকম হয়ে যায়, তখন নিজেকে এবং অন্যকে যেন চেনাই যায় না, আমরা সব অন্য-আমরা হয়ে যাই। আপনার কথাই ধরুন না কেন ? আপনি আজ যা আছেন দশ বছর আগে কি তাই ছিলেন ? পনের বছর আগের আপনি কি বেঁচেবর্তে আছেন এখনও ? মরে যান নি ? চিমটি কেটে দেখুন তো, কুড়ি পনের দশ বছর আগের আপনি বেঁচে আছেন কি না ? [উত্তেজিত হয়ে] বেঁচে নেই তো ! মরে গেছেন তো ! কে মারল ? ঈশ্বর ? পৃথিবী ? গভর্নমেণ্ট ? তা নয়। মেরেছেন আপনি, নিজের হাতে, স্বেচ্ছায়, একটু একটু ক'রে, শ্লো পয়জনিং, অথবা একেবারে, এক-আঘাতে। আপনাকে আপনি খুন করেছেন। করেছেন। করবেন। না ক'রে আপনার বাঁচবার উপায় নেই ; এক-আপনাকে মেরে অন্য-আপনার বেঁচে থাকা সম্ভব। বেঁচে থাকতে গিয়ে অনবরত আপনি আত্মহত্যা করছেন, নিজেকে গলা টিপে মারছেন, নয়তো রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে স্লিপিং পিলের ওভারডোজ নিয়ে পরম নিশ্চিন্তে গভীর আরামে মরে থাকছেন।

ঐ ছেলেটা, কি যেন একটা নাম ছিল ওর, চেষ্টা করলে মনে পড়বে, কিন্তু অত সময় নেই আমার, তাছাড়া মানুষের নামের মতো ভুল ও মিথ্যে আর কিছু নেই, তাই নয় কি ? এই যে আপনি, আপনার নাম তো প্রাণেশ চ্যাটার্জি, আপনি কি চিরদিনই প্রাণেশ চ্যাটার্জি ছিলেন, না থাকবেন ? এককালে আপনি হয়তো ছিলেন প্রাণেশ, তারপর হয়েছিলেন প্রাণনাশ, বর্তমানে হয়তো আপনি প্রাণান্ত, কিন্তু নামটা তো আপনার একই রয়ে গেছে ! আমি বাইশ বছর বয়সে যে ব্যক্তি ছিলাম, বিয়াল্লিশেও তাই থাকছি বাহান্নতেও তাই থাকবো ? অতএব ছেলেটার নামে কিছু যায় আসে না, যদিও নাম ওর একটা ছিল, চেষ্টা করলে স্মরণ হবে এখনও, কিন্তু ছেলেটা

এসেছিল আমার কাছে, কেন ভুলে গেছি, ও হ্যাঁ, যার জন্যে অনেকে আসে, মানে ঐ বয়সের, অমন স্বপ্নদেখা চোখ নিয়ে আর নরম কোমল মুখ, এসেছিল, আদর্শের তাড়নায়, আ-দ-র্শে-র— আমার কেমন ভাল লেগে গিয়েছিল, কাছেই রেখেছিলাম, কাজ করত, আমারই একটা প্রতিষ্ঠানে, যাকে আপনারা ইচ্ছে করলে ব্যবসা বলতে পারেন, আবার জনশিল্পও বলতে পারেন, আবার সমাজকল্যাণও। শেষ পর্যন্ত ছেলেটা বিগড়ে গেল, পাগল হয়ে গেল। লাগল আমার পেছনে। দু-চার বার সাবধান ক'রে দিলাম, ফল হ'ল না ; ছোট ছোট ভয় দেখাতে গিয়ে দেখলাম দুঃসাহস বেড়ে গেছে। শেষে অগত্যা শেষ ব্যবস্থা করতে হ'ল। পালাতে গিয়েছিল, পারে নি। পিস্তলের আওয়াজ শুনে চমকে উঠেছিল, চমকে উঠেছিলাম আমিও। চমক ভাঙবার আগেই প্রাণ বেরিয়ে গেল, বুঝলেন প্রাণেশবাবু, মরে যাবার পরে মুখে একটা অবাক চিহ্ন আর একটা বিরাট নালিশযুক্ত অক্ষরের মতো একে অন্যকে জাপটে ছিল, আর কি জানেন, ছেলেটার চিবুকে একটা বড় কালো তিল ছিল, স্বপ্নদেখা চোখ, আর কালোতিল চিবুক, আর নরম কোমল মুখ, আর মরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মুখ জুড়ে অবাক আর নালিশ, অবাক হবার কি মানে আছে ? নালিশ করবার কি মানে আছে ? কারা অবাক হয় ? নালিশ করে কারা ? একটু ভেবে দেখুন তো···

[সূর্যপ্রতিমের আত্মালাপের শেষাংশে আলো স্তিমিত হয়ে আসবে, দেখা যাবে কেবল তাঁর মুখ আর চোখ। এবং শেষ পর্যন্ত কেবল কম্পিত ওষ্ঠাধর। আলো নিভবে। মঞ্চ কয়েক মুহূর্তের জন্যে অন্ধকার। এবার ধীরে ধীরে আলোকিত হবে মঞ্চের দক্ষিণ অংশ, যেখানে পালঙ্কে আয়াসশয়নে বত্রিশ বছরের মণিমুকুল, যৌবন অস্তরাগে রঙিন। দর্শকদের দিকে মুখ ক'রে বিছানায় দেহ এলিয়ে

বুকের ওপর শুয়ে রয়েছে মণিমুকুল, লো-কাট ব্লাউজের মধ্যে স্তনের খানিকটা দর্শকদের চোখে পড়ছে। পা দুটি উঁচু ক'রে মণিমুকুল একটা অ্যালবামের পাতা ওল্টাচ্ছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ছবিগুলি দেখে তার দারুণ মজা লাগছে, এক একটা ছবি দেখে হেসে উঠছে]

মণিমুকুল : ও মাঃ, তুমি এমনি ছিলে দেখতে ছোটবেলা? কি মজা! এইটুকু ছোট্ট ছিলে, একরত্তি, নাক বলতে দুটো ফুটো, চোখ বলতে দু চিলতে করমচা ; আর একেবারে উদোম, ন্যাংটো! ছি, ছি, ছি, একটা ইজের তো পরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তোমার বাবা মার! তারপর, তারপর, তারপর, বাঃ, এটা বেশ, বড় হয়ে উঠেছ, চোখে কেমন আকাশ-আকাশ ভাব, ঠোঁটের ওপর কচি কচি গোঁফ গজিয়েছে, মুখে লজ্জার সঙ্গে মিশে আছে, কি মিশে আছে, জেদ? না, ঠিক জেদ নয়, ডিফায়েন্স! কি সর্বনাশ, এর মধ্যে এমন বড় হয়ে উঠলে? কোথায় গেল সেই আকাশ আকাশ চোখ, সেই লজ্জা নিজেকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা? এ যে একলাফে সবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা : এই আমি দেখে নাও, এই আমি! দাড়িগোঁফ কামানো মুখে কর্কশ অহংকার, কি জ্বলন্ত চোখ দুটো রে বাবা, কি দাম্ভিক চাপা হাসি। আমি কখনও তোমার এ চোখের সামনে দাঁড়াতাম না, তুমি তাহলে আমার সবকিছু দেখে নিতে, নিজেকে নিরাবরণ মনে হত, ছি, ছি, ছি। এটা মন্দ নয়, চোখের চাহনিটা নরম হয়ে এসেছে, দাড়িগোঁফে তোমাকে দেখাচ্ছে কোমল, খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি আর টুপিতে দেশনেতা-নেতা লাগছে, তাই না? তোমার হাসিটা কিন্তু বদলে গেছে, সেই দাম্ভিকতা আর নেই, কেমন কেমন হাতকচলানো হাসি, পরকে খুশি করার হাসি। বা রে ব্বাঃ, এটা তো একেবারে দারুণ! তুমি এবার সার্থক পুরুষ। মালায় মালায় বুক ভরে গেছে, মুখে কি পরিতৃপ্তির

খুশি, পৃথিবীকে দেখছ অনুকম্পার চোখে তোমার মধ্যে ডিফায়েন্স আর নেই, একেবারে নির্লিপ্ত। এবার তুমি শান্তকান্তকোমলগান্ধার, সবাইকে যেন বরাভয় দিচ্ছ, বলছ, আমার পিছনে চলো, আমি আছি। ভয় কি? হাঁ, এইবারে আরও একধাপ উঁচু, এবার তুমি বহুর বীর, অনেকের নেতা, বক্তৃতা করতে গিয়ে বুঝি অমন শিরা ফোলাতে হয়? আহা, বেচারা এত চেঁচিয়ে উত্তেজিত হয়ে বক্তৃতা করতে কষ্ট হয় না? গলার শিরা যদি ফেটে যায়, অথবা কপালের? একটু জল খেয়ে নেবে? সত্যি কি কষ্ট তোমাদের, না? এটা কিন্তু মন্দ নয়, পুরস্কার বিতরণ করছ তুমি, ও মা, তাইতো পুরস্কার বিতরণ করছ চিত্র তারক-তারকাদের! কার হাতে তুলে দিচ্ছ সোনার কলম? কি সর্বনাশ, তোমার মুখ চোখের অবস্থা অমনি কেন? তারকাটির দিকে অমন লোভী চোখে তাকাতে লজ্জা করল না তোমার? দেখতেও পাচ্ছ না তারকারা সব তোমার অবস্থা দেখে হাসছে? না, না, এটা ভাল করো নি, একটু ঢেকে রয়ে সয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে হয়, তারকাদের কাছেও। এর পরের বার আমাকে জিজ্ঞেস কোরো, শিখিয়ে দেব, তোমাকে দেখলে যদি ভয় না পেয়ে বসি—তোমাকে দেখলে ভয় হয় কেন বলো তো? এটা কিন্তু খুব মন্দ নয়! ওরা কারা? মজতুর? না, না, একদল চাষী। অমন অসভ্য কেন? ভাল ক'রে কাপড় পর্যন্ত পরতে জানে না! তোমাকে কিন্তু বেশ ভাল দেখাচ্ছে। কেমন মোটাসোটা, ভুড়িমুড়ি, জমজমাট শরীর, কিন্তু এ কি, চোখে মুখে তোমার ভয় কেন? ও মা, এই ন্যাংটা গরীব চাষীগুলোকে দেখে ভয় করছে না কি তোমার? হিহিহিহি, আহা বেচারী, তোমাকে ভয় পেতে দেখতে কিন্তু ভীষণ মজা লাগছে, মজা লাগছে ভাবতে তুমিও ভয় পাও, তোমরাও। তোমাকে দেখলেই আমি ভয়ে কুঁকড়ে যাই, কিন্তু, তুমিও তাহলে ভয় পাও! মোঠা

চাষীদের ভয় পাও! ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না যে!

[দর্শকের সম্বোধন করে, বিছানা ছেড়ে উঠে এসে, প্রাদপ্রাদীপের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে।]

জানেন, এ লোকটিকে আমি চিনি, আপনারাও চেনেন, আপনাদের চেয়ে আমি একটু বেশি, মানে, ঘনিষ্ঠভাবে, চিনি, যদিও আমার ভুল হতে পারে, মানে, সত্যিই কি কেউ কাউকে চিনি আমরা, স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে, পিতা পুত্রকে, আমি আপনাকে, আপনি আমাকে, সত্যিই কি আমরা চিনি, ভাল ক'রে সম্পূর্ণ ক'রে চিনি? তাহলে এ লোকটি যার ছবি-জীবনী এই অ্যালবাম, একে আমি ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছি অনেকদিন থেকে, যা আপনারা পান নি, যদিও এমন দিন বিশেষ যায় না আপনারা এর ছবি সংবাদপত্রে না দেখেন, বক্তৃতা বিবৃতি না পড়েন বা শোনেন। মানে আপনার আমার জীবনের অনেক কিছুর সঙ্গে এ লোকটি সংযুক্ত, যেমন নদীনালা-পুকুরসমুদ্রে মাছের অভাব নেই অথচ কলকাতার বাজারে মাছ উধাও, দাম দিতে আপনার পকেট গড়ের মাঠ। যেমন ধবধবে শাদা চিনি হঠাৎ কালোবাজারে গা-লুকিয়ে আপনার চক্ষে শর্ষেফুল ফোটায় যেমন বাসে চলতে গিয়ে আপনি ঠিক ঠাহর করতে পারেন না যাচ্ছেন আপিস না বৈতরণীর পরপার। যেমন স্কুলেপড়া ছেলের ষাট পয়সা দামের টেকস্‌ট বুক একটাকা পঁয়ত্রিশ পয়সায় কিনে এনে পাতা উল্টাতে গিয়ে দেখতে পেলেন লেখা রয়েছে 'মাইকেল মধুসূদনের জন্ম মেদিনীপুর জিলার বীরসিংহ গ্রামে'। আপনার জীবনের এমন সব তুচ্ছসামান্যনগণ্য ব্যাপারগুলোর সঙ্গে এই ভদ্রলোক জড়িত, অতএব এঁকে ছাড়া আপনার চলে না, আপনাকে ছাড়া উনিও অচল। এবং এই যে পারম্পরিক দড়িবাঁধা সম্পর্ক, একে তাজা

ক'রে পাকা-পোক্ত রাখবার জন্যে উনি আমাদের ধারাবাহিক অমৃত পরিবেশন ক'রে থাকেন। ঠিক দামে মাছ, চিনি, চাল, ইত্যাদি তুচ্ছ পদার্থ এঁর দৃষ্টিকে ঘোলাটে করে না। ইনি সর্বদা আপনার আত্মার, অর্থাৎ আপনি যেখানে সাধারণ মানুষের চেয়ে অন্তত দেড় ইঞ্চি বড়, তার রসদ যোগান। এই লোকটির বাণী প্রতিদিন শতসহস্র ধারায় সংবাদপত্রে, বেতারে, বক্তৃতায়, ভাষণে, আপনার জীবনসত্তায় প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, নিদাঘ বাস্তবের রূঢ় খরতা কেমন শীতল শান্ত সহনীয় হয়ে ওঠে।

এ মানুষটি, জানেন, একদিন, আমি যখন ওঁকে প্রথম দেখি, সে অনেকদিন আগে, একেবারে অন্য মানুষ ছিল, আপনার মতোই, একজন অসাধারণ সাধারণ মানুষ। ওঁর বাবা ছিলেন চব্বিশ পরগণার একটা স্কুলে অঙ্কের মাস্টার, আর উনি পড়তেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইতিহাসে এম. এ. পড়তেন, লেখাপড়ায় খুব একটা ভাল ছিলেন না, কিন্তু জীবনে ভাল কিছু একটা করবার আকাঙ্ক্ষা ছিল খুব। দুটো ভাল কাজ এম. এ. পড়ার সময় একসঙ্গে ক'রে ফেলেছিলেন, বলে দি আপনাদের ঘটনা দুটো? কি আর হবে বললে, উনি তো আর শুনতে পাচ্ছেন না, উনি নিশ্চয় আপনাদের মধ্যে বসে নেই, নাটক দেখবার সময় কোথায় ওঁর! ওঁকে যে সর্বদা নাটক করতে হয়! তাই ভাবছি বলেই ফেলি আপনাদের এসব সামান্য ঘটনা ওঁর জীবনকে কোনদিন স্পর্শ করে নি, আজ তো করবেই না। দুটো খুব ভাল কাজ সেই বাইশতেইশ বছর বয়সেই একসঙ্গে ক'রে ফেলেছিলেন, এবং তখনই বোঝা গিয়েছিল উনি একদিন মস্ত মানুষ হবেন। কাজ দুটো আর কিছু নয়, আমার সঙ্গে, মানে একটি কুমারী বাঙালী মধ্যবিত্ত কন্যার সঙ্গে, সে আমি না হয়ে আপনাদের মধ্যে যে কেউ হতে পারত। তার বাপ ছিল না, মা কর্পোরেশন স্কুল নামক গোয়ালঘরে বাছুর পড়িয়ে দুছেলে-

একমেয়ের ভার গ্রহণ করত। মেয়েটির দেহে যৌবন ছিল, এবং রূপ, মনে লোভ, যা যখন পাওয়া যায় তা পাবার লোভ, অথবা প্রেম, এবং মেয়েটির কুমারী বুক বিশ্বাসে নরম ছিল। এমনি একটি মধ্যবিত্ত বাঙালী কন্যার সঙ্গে, আমার সঙ্গে, প্রেম করেছিল, পুরো এক বছর পাঁচ মাস সতের দিন অর্থাৎ একত্রিশ হাজার আটশ চল্লিশ ঘণ্টা, এই হল প্রথম ভাল কাজ; দ্বিতীয় ভাল কাজ: এক বছর পাঁচ মাস সতের দিন পরে সেই মধ্যবিত্ত লোভী-লোভী কন্যাকে পুরানো ছেঁড়া ধুতির মতো অতি সহজে ফেলে দিয়েছিল। এটাও এমন কিছু মৌলিক ব্যাপার নয়, হামেশাই ঘটে থাকে, আপনারা ভাল ক'রেই জানেন। উনি তখন থেকেই মানুষটা ছিলেন অসাধারণ, অতএব, অনুমান করতে পারেন, এই সচরাচর ঘটনার মধ্যেই একটু-কিছু অসচরাচর ছিল। নিশ্চয় এবার আপনাদের কৌতূহল হচ্ছে, সেটা কি? এমন কিছু নয়, আমার, মানে একটি মধ্যবিত্ত লোভীলোভী কুমারী কন্যার, পেটে তখন বাচ্চা এসে গিয়েছিল।

[মণিমুকুল শেষ কথাগুলি ব্যঙ্গ হাসির সঙ্গে বলল, যে হাসির চাবুক খেল সে নিজে এবং দর্শকগণও, শেষ কথাগুলি বলার সময় কেবল তার মুখখানা দেখা যাচ্ছিল, এবং বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ অন্ধকার হল, এবার যখন আলো জ্বলল, মিনিট খানেক পরে, তখন মঞ্চের বাঁ দিকে পার্ক আলোকিত হল, দেখা গেল বেঞ্চের ওপরে বসে আছে একুশ বছরের একটি মেয়ে, নাম অনুভূতি, দেখতে অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, স্বভাবটিও খানিকটা তেমনি, মেয়েটির এলো চুল, চওড়া কপাল, কুছ-পরোয়ানেই হাবভাব, আর মুখেচোখে সর্বদা একটা সজীব বিস্ময়, যেন বেঁচে থাকাটা বিরাট ঘটনা, প্রায় মিরাক্‌ল্‌, যেন সবকিছুই নাটকীয় মূর্ছনায় ভাস্বর। অনুভূতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছাব্বিশ

বছরের যুবক শৌনিক, লম্বা দৃঢ় দেহ, চুল কদমছাঁট, রং কালো, পরনে সাধারণ প্যাণ্ট-হাফশার্ট, পায়ে স্যাণ্ডেল, দেখলে মনে হয় কোনও কারখানার কারিগর, আসলে শৌনিক ডাক্তার। দুজনকে দর্শকরা যখন পুরোপুরি দেখতে পাবেন তখন শৌনিক পকেট থেকে একটা আধপোড়া সিগারেট বার ক'রে দেয়াশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে জোরদমে ফুঁকছে। তার এক পা বেঞ্চির ওপর, এক পা পার্কের মাটিতে।]

অনুভূতি। [জীবন্ত কৌতূহলে] এটাও তোমার রুগীদের?

শৌনিক। নিশ্চয়।

অনু। তোমার কাছে যারা আসে তাদের সিগারেট শেষ করার সময় দাও না?

শৌনিক। যারা সিগারেট খায়, তাদের মধ্যে শতকরা তেতাল্লিশ জন আর্ধেক বা ষাট পার্সেণ্টের বেশি খায় না।

অনু। আর আধপোড়া সিগারেটগুলি তুমি বেছে বেছে পকেটে তুলে নাও।

শৌনিক। তাতে আমার সিগারেট কিনতে হয় না। খরচ বাঁচে।

অনু। অন্যের খাওয়া সিগারেট খেতে ঘেন্না করে না?

শৌনিক। অন্যের চলা পথে চলতে, অন্যের বলা কথা বলতে, অন্যের করা কাজ করতে, অন্যের অন্য অনেক কিছু করতে যদি ঘৃণা না হয় তাহলে

অনু। অন্যের কথায় উঠতে, বসতে, শুতে, অন্যের ইচ্ছায় বেঁচে থাকতে, অন্যের নির্দেশমতো ভাবতে, হাসতে, কাঁদতে—কি বলো?

শৌনিক। খুব ভাল লাগে। অন্যের খাওয়া সিগারেট খেতেও।

অনু। কিন্তু ওরা যে সব রুগী!

শৌনিক। কিন্তু আমি যে ডাক্তার!

অনু। রুগীরা ডাক্তারকে অসুস্থ করে।

শৌনিক। ডাক্তার রুগীদের অসুস্থ করে।

অনু। সুস্থ।

শৌনিক। অসুস্থ।

অনু। তুমি কি প্ল্যানিং কমিশন যে অসুস্থ অর্থনীতিকে আরও বেশি অসুস্থ ক'রে তুলবে ?

শৌনিক। কে নয় ? কে নয় প্ল্যানিং কমিশন ? এ দেশে একটি লোকের, একটি সংস্থার নাম করতে পার যে দিনরাত কেবল নিজের কমিশন প্ল্যান করছে না ?

অনু। আমি।

শৌনিক। [তাচ্ছিল্যের সঙ্গে] অ, তুমি ! তোমার জীবনে কোনও মিশন আছে, যে তুমি কমিশন চাইবে ?

অনু। আছে। শুনবে ?

শৌনিক। নাগরিকগণ ! রোমানগণ ! বঙ্গবাসীগণ ! শ্রবণ করুন।

অনু। [পরম আনন্দে] আমি বেঁচে থাকতে চাই।

শৌনিক। [চিৎকার ক'রে] গরীবি হটাও !

অনু। [চমকিত বিস্ময়] তার মানে ?

শৌনিক। দুটোই অসম্ভব। তুমি আর যাই পারো, বেঁচে থাকতে পারবে না। সেটি হবার নয়।

অনু। [উদ্ভাষিত প্রত্যয়ে] বেঁচে আমি থাকবোই, যতদিন না মরে যাই।

শৌনিক। টিঁকে থাকবে। প্রতিদিন, প্রতি বছর, একটু একটু, অনেকখানি, ফুরিয়ে যাবে। বেঁচে থাকতে ভয়ানক বিস্বাদ লাগবে, বিরক্ত লাগবে। একদিন দেখবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে জীবন নামক নেশা কবে কেটে গেছে টের পর্যন্ত পাও নি।

অনু। [দর্শকদের লক্ষ্য ক'রে] এ লোকটা কি সত্যি কথা বলছে ? আপনারা কেউ কি বেঁচে নেই ? কেবল টিঁকে আছেন ?

আপনাদের দেখে তো মনে হচ্চে না! এই তো কেমন সেজেগুজে খুশিমুখে অভিনয় দেখতে এসেছেন, আপনাদের সমবেত দেহ থেকে ঘাম এবং ক্লান্তির গন্ধের সঙ্গে বেলফুল আর বিদেশী সুগন্ধির সৌরভ, আমার নাকে লাগছে।

শৌনিক। [দর্শকদের] সত্যি কি বেঁচে আছেন আপনারা? সকাল থেকে সকাল পর্যন্ত কেটে যাচ্ছে না কি একটানা ক্লান্ত অস্তিত্ব রাখতে গিয়ে?

অনু। এ লোকটা বাজে কথা বলছে, একদম বাজে কথা। আমরা কি বেঁচে নেই? আমাদের শিরায় বইছে না তাজা লাল রক্ত? আমাদের বুকে কি নেই অতল জলের আহ্বান, চোখে দিগন্তহীন আকাশ, আমরা কি ভুলে গেছি চাইতে, দিতে, পেতে? ভালো-বাসায় বুক টন টন করে না আমাদের? প্রিয়তমের চোখে তাকিয়ে ভুলে যাই না আমরা কে, কেন, কোথায় কবে? আমাদের কি ভবিষ্যতের আশা নেই, বর্তমানের দাপটে কি আমরা নিঃস্ব? আমাদের দাবী কি কাঁপিয়ে তোলে না রাজপথ জনপথ? আমর কি জীবনকে গভীর ভালোবেসে মৃত্যুকে তুচ্ছ করি নে কখনও কে বলে আমরা বেঁচে নেই?

শৌনিক। এখানে অসীম ধৈর্য, পৃথিবীর মতো
সর্বংসহা বাঁচা অবিরত।
এখানে বিস্তৃত আয়ু, অভিজ্ঞ বৎসর,
হিমে হিমে বায়ুস্তর ঘর।

অনু। আমাদের কাছে তুচ্ছ ঋতুচক্র;
কাল নিরবধি।
চোখের পাতায় স্বপ্ন সমুদ্রের,
পায়ের পাতায় লেগে লেগে
মাটি ভাঙে;

কী উল্লাসে নাচতে নাচতে ছুটে যায়

নদী।

আমিও তোমাকে কাছে টানতে চাই

কলকল্লোলিত সে আবেগে।

শৌনিক। টানাটানি করবে না, বলে দিচ্ছি। ও আমার ভাল লাগে না।

অনু। কলকল্লোল ভাল লাগে? আবেগ?

[শৌনিক নীরব]

অনু। তা লাগবে কেন? বিকৃত বায়ু ভাল লাগবে, উড়ন্ত হাহাকার ভাল লাগবে—

শৌনিক। ইয়ার্কি হচ্চে? [অনুভূতির পেটে ধাক্কা দিতে যাবে, অনুভূতি তড়িৎ সরে গিয়ে]

অনু। খবরদার, পেটে মেরো না।

শৌনিক। পিঠে মারব?

অনু। [খুব সাধারণভাবে] পেটে ছেলে আছে।

শৌনিক। [শব্দগুলির মর্ম না বুঝে] ছেলে তো পেটেই থাকে। [হঠাৎ বুঝতে পেরে, পেছনে হটে, ভয়ে, বিস্ময়ে) কী বললে?

অনু। [মিষ্টি, মৃদু, শান্ত হেসে] কিছু না। পেটে ছেলে আছে। [দুজনে অনেকক্ষণ নীরবে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। এ নীরবতার বিলম্বিত মুহূর্তে দেখা গেল শৌনিক ভীত, আহত, শঙ্কিত, আনন্দিত, উত্তেজিত, এবং অনুভূতি শান্ত স্তিমিত পুলকে আত্মসুস্থির]

শৌনিক। কি বললে?

অনু। পেটে ছেলে আছে।

শৌনিক। কার পেটে?

অনু। আমার। এখানে।

শৌনিক। কার ছেলে?

অনু। আমার।

শৌনিক। আর কার?

অনু। যদি আর কারুর হয়ে থাকে, তোমার।

শৌনিক। কেন?

অনু। কোনও কোনও মনুষ্যকর্মের পরিণামে স্ত্রীলোকের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হয়ে থাকে।

শৌনিক। অ।

অনু। আ, ই, ঈ, উ, ঊ।

শৌনিক। ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান, মাঠে মাঠে গমের পাহাড়।

অনু। সাম্রাজ্য সুশান্ত, সুস্থির।

শৌনিক। বিমুগ্ধ জনতা নতনেত্র, দরবার।

অনু। দুষ্ট লোক, দুষ্টবাদ পলাতক।

শৌনিক। ফৌজসিপাহী প্রস্তুত।

অনু। বিত্তবানের পিত্তশূল।

শৌনিক। জোতদার, জমিদার গতরাত্রির দুঃস্বপ্ন।

শৌনিক। যুবশক্তি জাগ্রত দ্বারে।

অনু। বৃদ্ধেরা গেছেন পরপারে।

শৌনিক। প্রতিবেশী ভয়ে থর থর।

অনু। অর্থনীতি আত্মনির্ভর।

শৌনিক। উপদলপতি সব ঠাণ্ডা।

অনু। ঝাণ্ডাকে ক'রে নাও ডাণ্ডা।

শৌনিক। এক দল এক নেতা এক দেশ।

অনু। আগামীকালের মহানির্দেশ।

শৌনিক। আমলা কামলা সব সাচ্চা।

অনু। আমার পেটে আছে বাচ্চা।

শৌনিক। কি বললে ?
অনু। বাচ্চা। এখানে।
শৌনিক। কার ?
অনু। আমার।
শৌনিক। আর কার ?
অনু। আর কারুর নয়।
শৌনিক। [নিশ্চিন্ত] আমার নয় ?
অনু। আর কারুর নয়।

[দুজনে আবার কিছুক্ষণ নীরব]

শৌনিক। [হঠাৎ] তাহলে তো তোমাকে বিয়ে করতে হয় !
অনু। [হেসে অস্থির] তাই নাকি ? কেন ? বিয়ে করতে হয় কেন ?
শৌনিক। পেটে বাচ্চা এসে গেল যে !
অনু। আমার পেটে বাচ্চা তো তোমার কি ?
শৌনিক। বাঃ, বুদ্ধির বলিহারি। বাচ্চার মা থাকবে, বাবা থাকবে না ?
অনু। আমার ছেলেকে পিতৃত্ব দেবার জন্যে তুমি আমাকে বিয়ে করতে যাবে কেন ?
শৌনিক। ছেলে কার ?
অনু। আমার।
শৌনিক। আর কার ?
অনু! আমার।
শৌনিক। [ধমক দিয়ে] আমার আমার কোরো না। [দর্শকদের দিকে] মাথার একটু দোষ আছে।
অনু। [দর্শকদের] একটু নয়, বেশ খানিকটা। মাথার দোষ আছে বলেই তো মানুষ। গোরুমোষছাগলগাধাবাঘসিংহহরিণের মাথায় একটুও দোষ নেই।

শৌনিক। সব মানুষের মাথা বাদ দিয়ে দিন, পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ শ্রেণীসংগ্রাম কিচ্ছু থাকবে না। যতো সর্বনাশ সব এই মাথায়।

অনু। ব্রহ্মাণ্ড ঘিরে থাকবে প্রাচীন অন্ধকার। পৃথিবীতে যতটুকু আলো, সব এসেছে মানুষের মাথা থেকে। ঈশ্বর পর্যন্ত।

শৌনিক। আলোর অন্ধকার থেকে পালাবার পথ মানুষ আর পাচ্ছে না।

অনু। সংকট কিসের জানেন? সংকট মানুষের মাথা আছে বলে নয়, মাথা কম আছে বলে। আমরা যাকে মস্তিষ্ক বলি, আমাদের দেহের তা কতটুকু? মাত্র পঞ্চাশভাগের একভাগ। এই পঞ্চাশ-ভাগের একভাগ মধ্যেই আমাদের সবটুকু আনন্দ, সবটুকু যন্ত্রণা। ধরুন যদি আমাদের দেহের চারভাগ মস্তিষ্ক হত, তাহলে তবু এই জটিল পৃথিবীর আর ক্রমাগত স্ফীতমান মনুষ্যজাতির সমস্যাগুলির কিছুটা আমরা বুঝতে পারতাম। টু্য পার্সেণ্ট ব্রেন নিয়ে আমরা বর্তমান পৃথিবীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারছি না।

শৌনিক। বাজে কথা। সূর্যপ্রতিম চৌধুরীকে প্রশ্ন ক'রে দেখ, এমন কোনও সমস্যা নেই, কি ঘরের কি বাইরের, যার সবটুকু উনি বোঝেন না, জানেন না।

অনু। আমি মানুষের কথা বলছি।

শৌনিক। সূর্যপ্রতিম কি মানুষ···? [হঠাৎ অনুর কথার অর্থ বুঝতে পেরে] আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি চাইছ অনেক, আরো অনেক মস্তিষ্ক, চাইছ তো?

অনু। [একটানা অসহায় ভাব দেখিয়ে] কি করবো বলো! আমার এই এত বড় একটা দেহ—এর মাত্র টু্য পার্সেণ্ট মস্তিষ্ক। তাও ন বছর বয়সের মধ্যে দশভাগের ন' ভাগ তৈরি। ভাবতে পারো, বারো তেরো বছরের পর থেকে আমার এই টু্য পার্সেণ্ট মস্তিষ্ক-টুকুও আর বাড়ে নি! অর্থাৎ ন বছরের আমি আর আমার

বাবার মধ্যে মস্তিষ্কের প্রভেদ ছিল অতি সামান্য ? যা আমার ছিল না ন বছরে, আর আমার বাবার ছিল, তা হল কেবল অভিজ্ঞতা আর স্মৃতির সঞ্চয় ? মানে, দশবারো বছরের ট্যু পার্সেণ্ট মস্তিষ্ক এবং বাইশ বছরের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা, এই হল আমার একমাত্র আনন্দ ও যন্ত্রণার উৎস-ক্ষেত্র ! তাই তো আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারি নে, সব কিছুর অর্থ কেমন তালগোল পাকিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসে, আমি পালাবার পথ পাই নে।

শৌনিক। বোঝবার কি আছে ?

অনু। কিছু বুঝতে পারি নে, কিছু না। এই ধরো, বার বার ভূমি সংস্কার হচ্চে, উদ্বৃত্ত জমি বেরুচ্ছে না একটুও, গরীব চাষীর ঘর নেই জমি নেই তো নেইই। ধরো চাল গমের অভাব নেই, লোক মরছে ক্ষিধেয়। মানুষ চাঁদে গিয়ে পৌঁছল, অথচ পৃথিবীভরা এত দারিদ্র্য, এত হিংসা, এত পারস্পরিক পরিবর্জন। এবং দেখো না, পৃথিবীকে পঞ্চাশ একশ বার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করবার মতো মারণাস্ত্র গুদামে জড়ো ক'রেও ওরা কেমন আরও নিত্যি নতুন আরো ভয়ংকর মারণাস্ত্র তৈরি ক'রে চলেছে, অথচ ওদের শহরগুলি মরতে বসেছে, নদীর জল পচে গেছে, প্রতি মুহূর্তে নিশ্বাসের সঙ্গে নিজের হাতে তৈরি বিষ নিচ্ছে ওরা অন্ধ ঔদার্যে। ধরো, ভারতবর্ষ, সমাজতান্ত্রিক দেশ হয়ে গেছে। এত সব বড় বড় জটিল কত কিছু ঘটছে, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। কি ক'রে পারব ? আমার এত বড় শরীরটার ট্যু পার্সেণ্ট মাত্র বুঝতে পারে। অসম্ভব।

শৌনিক। ট্যু পার্সেণ্ট বুঝতে পেরেই পৃথিবীর এ অবস্থা, টেন পার্সেণ্ট হলে অস্তিত্বই আর থাকত না। আমাদের সৌভাগ্য, বুদ্ধিটা এখনও রেশন করা আছে। সূর্যপ্রতিম চৌধুরীর যদি টেন পার্সেণ্ট ব্রেন থাকত তা হলে কি হত ভাবতে পারো ?

অনু। সবকথায় সূর্যপ্রতিম চৌধুরীকে এনো না।

শৌনিক। আনতে হয় না, ওঁরা এসে পড়েন। হরিসভা, কবিসভা, নরসভা, বানরসভা সব কিছুতে এসে পড়েন ওঁরা। অন্নপ্রাশন থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত, গণেশ পূজার সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের পূজা হয়ে থাকে।

অনু। এ জন্যেই তো, ছেলে আমার, তোমার নয়।

শৌনিক। তোমার মস্তিষ্ক হাফ-পার্সেণ্টও নয়।

অনু। পশুশিশুকে মা বড় করে বলেই সে পশু হয়। মানুষশিশুকে বাবারা বড় করে বলে সে অমানুষ হয়।

শৌনিক। ওয়ান-ফোর্থ পার্সেণ্ট।

অনু। তোমরা, আপনারা, পুরুষরা, বাবারা, নিজেদের তৈরি দম-আটকানো প্রাণ-বন্ধকরা জীবনের ছাঁচে সন্তানদের তৈরি করেন। যেন বড় হয়ে তারাও আপনাদের মতো কেরানী হয়, কিংবা কভেনেন্‌টেড্‌ অফিসর, অথবা ডেপুটি সেক্রেটারী বা বড়বাজারের আড়তদার। যেন সেও আপনাদের মতো হাতকচলানো বশংবদ ভৃত্য হয়। কর্তার ইচ্ছায় ওঠে বসে। কর্তার হুকুমে হাসে। চোরাকারবার করে। ঘুষ নেয়। দেবদ্বিজে ভক্তি অটুট রেখে অনবরত মিথ্যে বলে। অন্যায় অবিচার যত বড়ই না হোক, প্রতিবাদের ধারকাছ দিয়ে না যায়। যে নিয়ম আপনাদের হাতে তৈরি, অথবা আপনাদের বাবাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত, তাই মানতে মানতে দিনে দিনে সেও যেন আপনাদেরই আর একজন হয়ে ওঠে। [শৌনিককে] না বাপু, বাবা দিয়ে আমার প্রয়োজন নেই।

শৌনিক। কুমারী মা এদেশে অচল দশ পয়সা।

অনু। বিয়ে ক'রে ছেলে হোক, তার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে। ছেলে হচ্চে বলেই বিয়ে হতে হবে, এর মধ্যে আছে একটা বাধ্য-বাধকতা, যা আমার কাছে অগ্রাহ্য।

শৌনিক। তবু এ ঘটনায় আমার একটা অংশ আছে তা তো তুমি মানছ ?

অনু। আছে এবং নেই।

শৌনিক। কি আছে, কি নেই ?

অনু। তুমি আছ, বাবা নেই।

শৌনিক। বাবা আছে, আমি নেই।

অনু। চেয়ে দেখ, বুঝতে চেষ্টা করো, ট্যু পার্সেন্টকে ফুল ফোর্সে ব্যবহার করো। দেখতে পারছ না, বুঝতে পারছ না, আমাদের কাল, এই বিংশ শতাব্দীর অন্তিম দশকগুলির পৃথিবী, এই ক্ষত-বিক্ষত আর্ধেক অবশদেহ সভ্যতা, এর কোন বাবা নেই, এ পিতৃহীন। এই পৃথিবী কেবল এক বিরাট দস্যুদলের কবলিত, তারা, এই পৃথিবীর সবটুকু রসদ, সবটুকু প্রাণরস লকলকে ক্ষুধায় ক্রমাগত গোগ্রাসে গিলছে! আরও চাই, আরও দাও, আরও ক্ষুধা, আরও তৃষ্ণা, দস্যুদলের সমবেত কণ্ঠ থেকে একমাত্র চিৎকার শুনতে পাচ্ছ না ? কোথায় পিতা ? কোথায় পিতামহ ? দেখতে পাচ্ছ না, রক্তের প্রবাহ, হিংসার দাবানল, ঘৃণার মরুভূমি ? দেখতে পাচ্ছ না, এই বিশ্বজোড়া দহনকে মিথ্যে পোশাকে মিথ্যে জৌলুসে সাজিয়ে তোমার আমার ট্যু পার্সেন্ট মস্তিষ্কটিকে ধুয়ে মুছে সাফ ক'রে দেওয়ার কি ব্যাপক আয়োজন! এ পৃথিবী, এ সভ্যতা, এ কাল পিতৃহীন, তুমি পিতা নও, এঁর কেউ পিতা নয়, কেউ নই আমরা কোনও পিতার সন্তান, এখন কেবল পিতৃহীন সন্তানদের আত্মসংঘাত, পরস্পরের সঙ্গে, দেশে দেশে সমাজে সমাজে, শহরে নগরে গ্রামে, বন্দরে বন্দরে

[অনু কথা বলার সময় শৌনিক ধীরে ধীরে সরে এসে ওর খুব সামনে দাঁড়াল, ওদের দেহ স্পর্শ করেছে, চোখে চোখ রেখে একজন বলছে অন্যজন শুনছে, যেন কোনও গভীর সত্যবাণী ওদের দুজনকে

একসঙ্গে প্রকম্পিত করছে। এই অবস্থায় মঞ্চ অন্ধকার হবে, অন্ধকার থাকবে কয়েক মুহূর্ত, তারপর আলো পড়রে মঞ্চের দক্ষিণ অংশে। মণিমুকুল টেলিফোনে কথা বলছে। তাকে দেখে মনে হবে কোন পার্টি-ফার্টিতে যাবার জন্যে তৈরী, সাজসজ্জায় মেকআপে বাড়াবাড়ি নেই, অথচ দেহের সবটুকু জৌলুস পরিস্ফুটিত। মণি-মুকুল কথা বলছে বেশির ভাগ দাঁড়িয়ে, কদাপি কখনও বসে, দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় এদিকে ওদিকে চলছে, কিন্তু তার দৃষ্টি, এবং তার বাক্য ও শব্দগুলি, দর্শকের প্রতি নিবদ্ধ।]

মণিমুকুল। কি বললে? বেরুচ্ছিলাম কিনা? না, না, মোটেই বেরুচ্ছিলাম না, এই তো একটু আগে চান সেরে শাড়ি বদলে …না, না, বাপু, তোমার অত ভদ্রতা করতে হবে না…বেশির ভাগ সময় তো একা কাটে, কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারলে বেঁচে যাই, তার ওপর তোমার মতো কাউকে পেলে তো কথাই নেই… কি বললে? খুব বাড় হয়েছে তোমার আজকাল, খুব কথা বলতে শিখেছ…সুন্দর না ছাই, মেঘে মেঘে বেলা তো কম হল না… না, না, না, বুড়ো হতে চলেছি, দেখতে পাচ্ছ না! …খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে শিখেছ, আসলে মিথ্যে কথা লিখে লিখে তোমাদের মুখে আর সত্যি কথা আসতে চায় না…মিথ্যে লেখ না তোমরা? যা লেখ সব সত্যি?—কি জানি, আমার তো মনে হয় না, পড়ে মনে হয় তোমরা কিচ্ছু জান না, কিচ্ছু দেখতে পাও না, দেখতে চাও না, কেবল চোখ বুজে, দম বন্ধ ক'রে দিনরাত লিখে যাও—কি বললে? পড়েছি বই কি, তোমার সব বই আমি পড়েছি; না, না তোমার বইতেও অনেক রুচি কোমল সুকান্ত মিথ্যে কথা থাকে। মিথ্যে মানে কি? যা সত্য নয়, তাই মিথ্যে। কি বললে তা নয়? সত্য কি? খুব মুশকিলে ফেললে তো! সত্য মানে সত্য, যা ঘটে, আমাদের

ভেতরে, বাইরে, তাই হল সত্য! কি ক'রে জানি কি ঘটে? বাঃ, জানি মন দিয়ে, মাথা দিয়ে, আবার কি দিয়ে? তা হবে, মাঝে মাঝে যা ঘটে না তাও সত্য বটে, মানছি, কিন্তু যা ঘটে আর যা ঘটে না, তা কি একই কথা হল না? এবার আমি হেঁয়ালি করছি? তা একটু করছি, হেঁয়ালির একচেটিয়া অধিকার কি তোমাদেরই? কি? কি বললে? বুঝতে পারছি না···তাই নাকি? আমাকে নিয়ে? উপন্যাস? কে লিখবে, তুমি? কেন, হিরোইনের কালোবাজারে নতুন কিচ্ছু কেনবার মতো রসদ নেই? শোনো, শোনো, আমাকে বলতে দাও। আমি যদি তোমার উপন্যাসের হিরোইন হই, আর তুমি যদি মিথ্যের পর মিথ্যে দিয়ে গল্প না বানাও, তাহলে কি বিপর্যয় ঘটবে ভেবে দেখেছ? কি বললে? সিনেমার কাহিনী? সোনায় সোহাগা। সত্যের সতীন আমাদের বাংলা সিনেমা, শুধু বাংলা কেন, ইংরেজী সিনেমাও···না, না, ব্যাপারটা তা নয়, ওটা তোমাদের চলতি অজুহাত। অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা ব্যাপারটা খুব আপত্তিকর নয়, যদি না দুটোই মিথ্যে হয়, তোমাদের অর্ধেক মানবীও ঝুটা, অর্ধেক কল্পনাও। আমার মনে হয় আসলে সমস্যাটা তা নয়। রিয়ালিটি বলে মৌলিক কিছু নেই। আছে কি? ধরো দেশে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে। যারা না খেতে পেয়ে মরছে আর যারা গভর্নমেন্ট চালাচ্ছে, এ দু'এর বাস্তব কি এক? তুমি তোমার মাথা চোখ দিয়ে যা দেখছ, মন দিয়ে যা বুঝছ, তাই নিয়ে তোমার বাস্তব; আমার বাস্তবের সঙ্গে তার মিল নাও হতে পারে, তাই না কি? মানছ তো! লক্ষ্মী ছেলে। ও তাই নাকি, তুমি বুঝি এখন মস্ত বড় হয়ে গেছ, বাবার মতো বড়ো? আমার কাছে কিন্তু তুমি এখনও সেই আকাশ-মুখ ছোট্ট ছেলেটি, যে আমার মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতো। কি? এখনও থাকো? আবার মিথ্যে কথা বলছ? তোমার সেই

অবাক বিপন্ন বিস্ময়ের দৃষ্টি কিন্তু আমি কখনও ভুলব না…আঠার বছর? তখন তোমার আঠার বছর বয়স ছিল? মনে হত না কিন্তু, মনে হত বড় জোর ষোলো…না খুব একটা পাকা ছিলে বলে তো মনে পড়ছে না, তাহলে সবকিছুতেই অমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে না…না, না, তোমার তখনও বেশ একটা ইনোসেন্স ছিল, তুমি যখন তাকাতে, মনে হত তুটি বড় বড় মোমবাতি জ্বলছে…তাই নাকি, উপমাটা মনে লেগেছে? মুখে এসে গেল বলে ফেললাম, হয়তো কোথাও পড়ে থাকবো, তোমাদেরই কোনও মিথ্যে কথা গল্প-উপন্যাসে! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে। তুমি বিস্ময়ে একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিলে, আমার খুব মনে আছে…মোটেই না, আমি একেবারেই ভাবি নি তুমি আমার ঘরে এসে বসবে, স্নানের ঘর থেকে হরদম আমি ওরকম চলে আসি শোবার ঘরে, হরদম। না, না, রাগি নি তো, অপ্রস্তুত হয়েছিলাম, হঠাৎ তোমার দৃষ্টিতে নজর পড়ল, তোমার বিস্ময় দেখে আমারও বিস্ময় লাগল, না, তোমার চোখে সেদিন একটুও লোভ ছিল না, মন্দিরে দেবতার সামনে তুটি জ্বলন্ত মোমবাতির মতো ছিল তোমার দৃষ্টি, আর তাই আমি এসে তোমার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, মনে আছে, তুমি একটা কথাও বলো নি, একটু নড়ে নি তোমার দেহ, তোমার দৃষ্টি। তোমার সামনে দাঁড়িয়ে কি মনে হয়েছিল জানো? বলব? আচ্ছা বলছি। মনে হয়েছিল জীবনে প্রথমবার আমার দেহ পবিত্র হল, একটি মানুষের পূজা তো সে পেল! আর তাই তোমার সামনে এমনি ক'রে দাঁড়াতে পেরেছিলাম, তোমাকে বলতে পেরেছিলাম, ভাল লাগছে দেখতে আমাকে? তুমি কি বলেছিলে? মনে নেই তোমার? মোটেই না, তুমি কিছু বল নি, মাথাও নড়ে নি তোমার, কিছু বলার দরকারও ছিল না, তোমার নীরবতা ছিল মুখর। কি? তুমিও যেমন? এ

নিয়ে সিনেমার কাহিনী হবে আমাদের দেশে ? পঞ্চাশ একশ বছরে নয়। আমরা বেঁচে থাকতে তারক-তারকারা চুমু খাচ্ছে দেখতে পেলেই বিপ্লব ঘটল মনে করবো। কি বলছ যা তা! ন্যুড না দেখিয়ে এ কাহিনীকে সিনেমা করা কি করে সম্ভব ? সম্ভব তো সবই আমাদের ছায়াচিত্রে, কিন্তু ওর মধ্যে আমি নেই। তাই তো বলছিলাম তোমার কাহিনীর নায়িকা হবার যোগ্যতা আমার নেই …আবার বলো…তাই নাকি ? আমার জীবনের অন্য কোনও বড় ঘটনা ? ভেবে দেখতে হয়! বড় কিছু তো ঘটেছে বলে স্মরণ হচ্ছে না! আমার বাবা ? আমার বাবা ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, এলাহাবাদে, বুঝলে, একেবারে ঋষিতুল্য মানুষ, বেদান্ত ছাড়া কিছু জানতেন না, আমিও এলাহাবাদেই মানুষ, ওখানেই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়,—কি ? কি শুনেছ তুমি ? না, না, মাসকয়েক কলকাতায় পড়েছিলাম মাত্র, কলকাতার লোক আমরা নই, আমরা উত্তর ভারতের, তোমাদের অতুলপ্রসাদ সেনের দেশের লোক, আমার বাবার তিনি খুব বন্ধু ছিলেন, না, না, না, গাইতে আমি পারিনে, কোনওদিন না, আমার গলা মিষ্টি ? তাহলে গলা সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান খুব কম। হ্যাঁ বলেছি, ছোটবেলা আমার মা মারা যান। কত ছোটবেলা ? বারো বছর, বারো কি চোদ্দ ঠিক মনে নেই। বাবা আর আমি একলা তখন থেকে…না, না, একলা থাকতে খুব ভাল লাগত আমার, বাবা তো বেদান্তে ডুবে থাকতেন, আমার স্বাধীনতা ছিল প্রচুর। কি করছি, কোথায় কার সঙ্গে যাচ্ছি, কি বই পড়ছি, পুলিশি করবার ছিল না কেউ ··একটুও না, একটুও বকামি করি নি তখন। ঠিক বলেছ, মনের মধ্যে সর্বদা কেউ বলত, বাবা তোমায় পূর্ণ বিশ্বাস করছে, তার বিশ্বাসে আঘাত কোরো না। ঠিক তাই। না, কলেজে তো নয়ই, বিশ্ববিদ্যালয়েও নয়, কারুর সঙ্গে তেমন ভাব হয় নি…মানে আলাপ সালাপ ছিল অনেকের

সঙ্গে, বন্ধুত্বও, হৈচৈহুল্লোড়ের অভাব ছিল না। কিন্তু প্রেম! মহব্বৎ !! উটি কারুর সঙ্গে নয়। কি? বিশ্বাস হচ্চে না। সত্যি বলছি, মাইরী বলছি। দাঁড়াও, একটু ভেবে নিতে, মনে করে নিতে দেবে তো! তারপর যেবার এম. এ পরীক্ষা সেবার একটা ঘটনা ঘটল। না, না, শোনই না, বলছি তো, তুমি যা ভাবছ তা নয়। চীন তখন ভারতের সঙ্গে দারুণ দুশমনী করছে। আমরা অনেকে খুব উত্তেজিত। মানে ছাত্রছাত্রীরা। আমার তো ইচ্ছে করছিল বন্দুক হাতে ক'রে সীমান্তে চলে যাই! কি বললে? খুব বাজে কথা। মেয়েদের হাতে অস্ত্র দিয়ে দেখ, তারা পুরুষদের চেয়ে কোনও অংশে খারাপ লড়াই করবে না, বরং ভাল করবে। আমার তো তাই বিশ্বাস। আসলে কি জানো, তোমাদের এই পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েদের তোমরা গৃহিণী আর শয্যা-সঙ্গিনী এই দুই ভূমিকা ছাড়া আর কোনও ভূমিকা দিতে রাজী নও। তোমরা যদি 'মেল শভিনিস্ট' হতে পারো আমরা কেন পারব না 'ফিমেল শভিনিস্ট' হতে? তা ছাড়া, আচ্ছা, আচ্ছা, সে কথাটাই বলছি। তখন, সেটা বোধকরি ১৯৫৯ সাল, হ্যাঁ ঠিক তাই, আমাদের শহরে একজন বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হল। ঠিক ধরেছ। উনিই। তাঁর ভাষণ শুনে আমি তো একেবারে মুগ্ধ। বুকের মধ্যে সে যে কি বিপ্লব, তোমায় কি বলবো! বাবার তো দার্শনিক হিসেবে খুব নাম, উনি একদিন বাবার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের বাড়ি চলে এলেন। ভেবে দেখ ব্যাপারটা। এত বড় একজন নেতা, যাঁর দর্শনের জন্যে লক্ষ লোকের ভিড়, চলে এলেন আমাদের মতো সামান্য লোকের বাড়ি। সেদিন আমি এক কাণ্ড ক'রে বসলুম। ওঁকে বললুম, আমি ওঁর সঙ্গে কাজ করতে চাই—যে কাজই হোক, যত সামান্য কাজই হোক, তবু তো তা দেশের কাজ হবে! উনি আমায় গ্রহণ করলেন। সেই থেকে আমি ওঁর সঙ্গে

—ওঁর কর্মসঙ্গিনী, ওঁর কাজে যেটুকু সাহায্য করতে পারি তাতেই আমার পরম পরিতৃপ্তি। কি বললে? বিরাট নায়কের সঙ্গ আমার কেমন লাগে? তোমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয়। ক্লিওপাট্রার চোখে সীজর কি ছিলেন আমি কি ক'রে বলবো? তোমাদের মতো অত বইপড়া বিদ্যা তো আমার নেই! তবে হ্যাঁ, একট বলতে পারি যে তোমরা যা'দের নায়ক মহানায়কের ভূমিকায় দেখতে অভ্যস্ত, তারাও রক্তমাংসের মানুষ, তাদের মধ্যেও মানুষের সবকিছু দুর্বলতা রয়েছে, থাকবেই। না, তা নয়। তোমরা ওঁদের দোষগুণ সবটাকেই বড্ড বেশি ক'রে দেখ, আসলে ওঁদের কাছ থেকে সর্বদা এমন সব কিছু প্রত্যাশা করো, যা কোনও মানুষই দিতে পারে না, ওঁরা তো নয়ই। ওঁরা আর আমরা তো একই জলমাটি আকাশ বাতাসের তৈরি, নয় কি? কি বললে? না, আমার কোনও রাজনৈতিক উচ্চাশা নেই, হ্যাঁ, একবার অমন একটা কথা হয়েছিল বটে। উনিই বলেছিলেন আমাকে বিধান সভার নির্বাচনে দাঁড়াতে। দাঁড়ালে হয়তো জিতে যেতাম, তখনকার দিনে তো আমাদের পার্টি যাকে দাঁড় করাত সেই জিতে যেতো। না আমিই দাঁড়াতে চাই নি। তা তুমি একেবারে ভুল বলো নি, মন্ত্রী হলে নিতান্ত খারাপ মন্ত্রী হতাম না, অনেক কিছু করবার সুযোগ পেতাম, দেশের জন্যে, জনসাধারণের জন্যে। তা ছিল বৈকি, এখনও আছে, আমার তো মনে হয় মেয়েদের মধ্যে নতুন একটা আন্দোলন গড়ে তোলা খুব দরকার। কিসের আন্দোলন? না, উইমেনস লিবারেশন নয়, ওটা আমাদের দেশে অবান্তর। তবে মেয়েদের অধিকারগুলি এখনও অস্বীকৃত, এই ধরো 'অ্যাবরশন', আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এটা লিগালাইজ করা উচিত, কোনও মেয়ে যদি অনিচ্ছায় বা অসতর্কতার জন্যে অন্তঃসত্ত্বা হয়, কিংবা ধরো কোনও দুষ্ট পুরুষ তাকে সময় বুঝে ল্যাং মারল, বিয়ে করবে বলে তার দেহ ভোগের

সুযোগ নিয়ে শেষ মুহূর্তে তাকে নর্দমায় ফেলে দিয়ে সটকে পড়ল, এমন দুর্ঘটনা তো প্রায়ই ঘটে থাকে, তাহলে সে মেয়ের 'অ্যাবরশন' করিয়ে নেবার আইনত অধিকার থাকা উচিত। কি? না, না, ব্যাক্তগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি না, যদিও এ ধরনের কেস আমি জানি, নিজের চোখে দেখেছি। কি শুনতে চাও? একটা কেস, যা আমি নিজে জানি? একটা কেন, অনেক, অনেক। আমাদের দেশে বিয়ের আগে অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের সংখ্যা খুব কম নয়, যদিও তাদের কোনও পরিসংখ্যান নেই। সামাজিক কারণে এসব নিয়ে কোনও অনুসন্ধান বা গবেষণা তো হয় না আমাদের দেশে! তবু আমরা অনেকেই জানি দু চারটে এ ধরনের কেস, তার মানে সংখ্যা বেশ বড়ই হবে, কি বলো? অনেক সময় মেয়েরা লোভে পড়ে অনেক কিছু ক'রে বসে। কেন করবে না, তারাও তো মানুষ, তাদের শরীরে রক্ত আছে, বুকে বন্যা বইতে কতক্ষণ? আর কি জানো? এমন অনেক পুরুষ আছে, যাদের তোমরা অনেক বড় বলে জান, অথচ যাদের জীবনের খানিকটা ভীষণ অন্ধকার, তারা এমন অনেককিছু ক'রে পার পেয়ে যায় যা তোমরা পারো না, আমি তোমার কথা বলছি না, তুমি অনেক কিছু ক'রে পার পেয়ে যাও, ভালই জানি আমি, আপত্তি করলে শুনবো কেন, আমি বলছি সাধারণ মানুষের কথা। আসলে কি জানো, কে কে বড় আর কে যে ছোট বুঝে ওঠা খুব শক্ত, আমি তো অনেক বড় বড় মানুষ দেখলাম, অনেক সময় আমার মাথা গুলিয়ে যায়, যে বড়, কে ছোট বুঝে উঠতে পারি নে। বোধহয় সব মানুষই আসলে এক, অত্যন্ত দুর্বল এবং ভঙ্গুর, মোমের মতো, আগুনের তাপ লাগলেই গলে যায়, আগুনের অনেক রূপ—টাকা, স্ত্রীলোক, ক্ষমতা, আরাম, তাই না? আসলে বোধহয় সুযোগ পেলে একশজনের মধ্যে নব্বই জনই ঠিক একই রকম গলতে থাকে, দশ জন যদিনা গলে

সেটাই আশ্চর্য। কথাটা ঠিক বলছি না? আচ্ছা, যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের এই যে এতো প্রাচীন, এতো জাহির করা নীতি, নৈতিক শাসন, এসবের শক্তি কি খুব কম নয়? অনেক সময় ভাবি আমি কথাটা নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখতে চাই, আমি কতোখানি 'সু', আর কতোখানি 'কু', ঠিক বুঝে উঠতে পারি নে। ধরো, ছোটবেলা আমাদের পাঠ শুরু হয় একটি কড়া আদেশ নিয়ে —"সদা সত্য কথা বলিবে"। একদিকে আমরা এ পাঠ বার বার উচ্চারণ করি, অন্যদিকে প্রয়োজন হলেই মিথ্যে বলি। কেন বলি? আমার তো মনে হয়, আমরা মিথ্যে বলতে শিখি দু কারণে— ছোটবেলাই আমরা বুঝতে পারি বড়রা হরদম মিথ্যে বলছে আর মিথ্যে করছে বড়দের আর্ট শিখে নিতে আমাদের সময় লাগে না। আর মিথ্যে বলি নেহাত আত্মরক্ষার জন্যে, মানে ভয় পেয়ে। ঠিক কথাটা বলে ফেলেছি এবার, বুঝলে? ঠিক কথাটা হল ভয়। ভয় আছে বলেই আমাদের সমাজ আছে, রীতিনীতি আছে, গভর্নমেন্ট আছে, এমন কি ভগবান আছে। ভয় না থাকলে এসবের কিছুই থাকতো না, আমরা সবাই অন্য মানুষ হয়ে যেতাম। তাই নয় কি? একদিন উনি একটা কথা বলেছিলেন, আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল, বলেছিলেন, যতদিন দেশের জনসাধারণের মনে ভয় আছে, ততদিন আমাদের কোনও চিন্তা নেই, ভয় কেটে গেলেই বিপদ। কি বলছ? আমি ভীতু কিনা? নিশ্চয়! কে ভীত নয় বলো? আমি তো বটেই।

[মণিমুকুল এখন ভুলে গেছে যে টেলিফোনে কারুর সঙ্গেও কথা বলছে। টেলিফোনের রিসিভার হাতে রেখে দর্শকদের কাছে মণিমুকুল বলছে :]

ভয়! ভীষণ ভয়। ঐ লোকটিকে আমার ভীষণ ভয়। ভয়ের

শিকলে আমি ওঁর কাছে বাঁধা। আমার মুক্তি নেই। আমার কখনও, কোনও দিনও, মুক্তি নেই।

[মঞ্চের এ অংশ অন্ধকার হবে, আলো পড়বে মধ্যাংশে, দেখা যাবে সূর্যপ্রতিম চৌধুরী বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা করবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, তাঁর মুখের সামনে মাইক, মাইকের মুখটা তিনি হাতের কব্জায় শক্ত ক'রে ধরেছেন, তাঁর মুখের ও অবয়বের ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে তিনি কিছুক্ষণ ধরে বক্তৃতা ক'রে চলেছেন, জনতার সঙ্গে ইতিমধ্যেই তাঁর উচ্ছ্বসিত যোগস্রোত স্থাপিত হয়েছে, তিনি উত্তেজিত, অনুপ্রাণিত, নিজের ক্ষমতার আস্বাদে অত্যন্ত পুলকিত]

সূর্যপ্রতিম।—না, না, আমি বিশ্ব মানি না, পৃথিবীর কোনও মানে নেই আমার কাছে, আমি মানি কেবল স্বদেশ, আমার দেশ, আমার মাতৃভূমি, তারই ইতিহাসে আমি আচ্ছন্ন, আমার সত্তা তারই ইতিহাস থেকে জন্ম নিয়ে তারই ইতিহাসে বিলীন। এ ইতিহাস কি বলে আমার কানে, বীজমন্ত্রের মতো, অহর্নিশি, প্রতিদিন? আমি কি দেখতে পাই আমার স্বদেশের ইতিহাসে, কি পাই শুনতে? অশ্বের খুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রের ঝনঝনা সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পাণ্ডুরতা, বিজয়ী সেনানীর বিপুল জয়ধ্বনি, বিজয়ী বীরের দৃপ্তপদক্ষেপ। এই আমার দেশ, যার পতাকা গৈরিক হলেও তা দুর্বলের পরাজয়ের নিশান নয়, সবলের সদম্ভ সমরাহ্বান। এদেশকে যারা বিভেদের চোখে দেখে, ভাষার বিভেদ, ধর্মের, জাতীয়তা-বাদের অথবা শ্রেণীর, তারা দেশের শত্রু। আমার স্বদেশ বিভেদ জানে না, একত্ব জানে, সংঘাত জানে না, সমন্বয় জানে, গৌরব —তার একাত্মবোধ, বহুকে নিয়ে সে এক। অতএব এ দেশের প্রকৃত প্রতিভা তখনই সম্পূর্ণ বিকশিত হবে যখন আমরা আবিষ্কার করব এক নেতা, এক মত, এক পথ, এক দল। যারা এ ঐতিহাসিক মহাসত্য জানে না, মানে না, তারাই আমাদের প্রথম

এবং প্রধান দুশমন। আমরা চিরদিন সমাজকে রাষ্ট্রের চেয়ে বড় ক'রে দেখেছি, সমাজ যদি না রইল তাহলে আমাদের মৃত্যু। সমাজ মানে কি? সমাজ মানে শৃঙ্খলা, সংহতি, সমন্বয়। শৃঙ্খলা আসে কোথা থেকে? বলিষ্ঠ অভিভাবক থেকে। যে সমাজের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, তা ভেঙে গেছে, তার মৃত্যু আসন্ন। অতএব বেঁচে থাকবার, সুস্থ সবল পদক্ষেপে এগিয়ে চলবার প্রথম প্রয়োজন বলিষ্ঠ, সুস্থির নেতৃত্ব। বন্ধুগণ, ইতিহাসপতির উদার আশীর্বাদে আমাদের দেশ আজ এ শুভ অবস্থায় উপনীত। আমরা কাণ্ডারীবিহীন তরণী নই, আমাদের ভাগ্যের কম্পাস হিমগিরির চেয়েও উঁচু নেতৃত্বের হাতে সুরক্ষিত। এখন থেকে আমাদের যাত্রা এক গিরিশৃঙ্গ থেকে অন্যগিরিশৃঙ্গে, যাত্রাপথের সব বিঘ্ন ফুৎকারে নিশ্চিহ্ন। বাধা বিঘ্ন আমরা মানতে রাজী নই, বিজয় আমাদের চাইই চাই, কি রণে, কি নির্বাচনে, বিজয় আমাদের চাইই চাই, ক রণে কি নির্বাচনে, কি রণে কি নির্বাচনে।

[মঞ্চের মধ্যাংশ অন্ধকার হল, কিন্তু এখনও বিজয়বাদ্য দর্শকরা শুনতে পাচ্ছেন, একটু পরে স্তিমিত আলো পড়বে মঞ্চের বাম অংশে, পার্কে। বেশ খানিকটা রাত হয়েছে। পার্ক নির্জন। বেঞ্চির ওপর বসে আছে একটি লোক, নাম অবিনাশ ধর, বয়স আটান্ন, দেখায় আটষট্টি, পাকা চুল অবিন্যস্ত, গালভরা তিনচারদিনের পাকা দাড়ি, শূন্যশীর্ণ দেহ, কিন্তু চোখ দুটোয় মাঝে মাঝে হঠাৎ আগুনের ঝিলিক। অবিনাশ ধর বসে আছে হাঁটুর ওপরে মাথা রেখে। দু বাহু মাথার ওপরে তালাবদ্ধ দর্শকরা যখন তাকে পুরো দেখতে পাচ্ছেন তখন তার কুণ্ডলীপাকানো দেহ কাঁপছে, হাসিতে না কান্নায় দর্শকরা বুঝতে পারছেন না। মিনিট খানেক পর দেখা গেল অবিনাশ ধরের দেহ কাঁপছিল হাসিতে, আনন্দের হাসি নয়, বিদ্রূপ ও নৈরাশ্যের দমকা হাসি। হাসির শেষ রেশটুকু বজায়

রেখে অবিনাশ ধর উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে এল দর্শকদের সামনে, এমনভাবে তাকাল যে জীবনের ভাণ্ডারে রহস্যের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই, সবাই সবকিছুর সবটুকু বুঝে গেছে, অবিনাশ ধরও, এবং বুঝে গিয়ে জানতে পারছে জীবনটা একটা বিস্বাদ রসিকতা মাত্র, হাসিও পায়, হাসতে ইচ্ছেও হয় না। এখানে নাটকের পরিচালকের মনে রাখা দরকার, অবিনাশ ধরের আত্মালাপ তার খণ্ডিত মানসের পরিচয় বহন করবে। সে একসঙ্গে অনেক কথা দিয়ে তার বক্তব্য প্রকাশ করবে না, একএকবার একটু একটু কথা দিয়ে, কখনও কম, কখনও কিছুটা বেশি। আসলে তার বিশেষ কিছু বলার মানে নেই, অতএব সে যা বলছে, সেগুলো সংক্ষিপ্ত ঝিলিক মাত্র ধারাবাহিক নীরবতার অন্ধকারে। আলো আঁধারের ব্যবহারে অবিনাশের এই খণ্ড-বিখণ্ডিত আত্মালাপ দর্শকদের কাছে প্রকাশ করতে হবে, এক একটি টুকরো আত্মালাপের পর, অবিনাশকে অন্ধকারে লুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে, অথবা আলোর ব্যবহার এমন হতে পারে যে মনে হবে পার্কের তরল অন্ধকারে এক একবার সে ভেসে যাচ্ছে, আবার দেখা যাচ্ছে তাকে।]

অবিনাশ। পোকার নাম মানুষ, আশার নাম ফানুস। বুঝলেন? উপসংহারটা বলে দিলুম প্রথমেই। পোকার নাম মানুষ, আশার নাম ফানুস। কিউ. ই. ডি.।

ঠিক হল না শুরুটা? আগেই সব ফাঁস হয়ে গেল? গল্প বলার রীতি এ নয়? গল্প কোথায়? আটান্ন বছরে কি দেখলুম জানেন? গল্প নেই। ইনিয়ে বিনিয়ে বুনে-বুনে বলবার নেই কিছু। ব্যাপারটা অতি সহজ, অত্যন্ত সরল। ধারাপাত। জল পড়ে, পাতা নড়ে, ঘরে ঘরে, লোক মরে। এক দুগুনে দুই, উঠি বসি শুই। দুই দুগুনে চার, পেটে পিঠে মার। তিন দুগুনে ছয়, যার যেটুকু হয়। চার দুগুনে আট, ইয়েস নো বাট। পাঁচ

দুগুনে দশ। আমি আপনার বশ। ধারাপাত। জল পড়ে, পাতা নড়ে, ঘরে ঘরে লোক বাড়ে।

গল্প নেই। শূন্য। আপনাদের আছে? আছে কিছু বলবার মতো ইনিয়ে বিনিয়ে বুনে বুনে? তা হলে উঠে আসুন। বলুন। অনেক দিন গল্প শুনি নি। এক রাজা, তিন রানী, ত্রিশ রাজপুত্র কালে কালে হয়ে গেল সব মলমূত্র।

আমার নাম অবিনাশ ধর। পিতা চন্দ্রবিন্দু কিশোরীমোহন ধর। জিলা বরিশাল, মৌজা মৌলভীঠাকুর, গ্রাম হাতিঘোড়া। চিনতে পারলেন আমাকে? পরিচয় পেলেন কিছু আমার? চিনলেন না? হ্যাঁ, বি. এ. পাস করেছিলুম, কোন সালে ভুলে গেছি, স্কুলে পড়িয়েছি অনেক দিন, বছরের পর বছর, কত বছর তা ভুলে গেছি, কাদের পড়িয়েছি ভুলে গেছি, আপনাদের কাউকে নয়, ভয় পাবেন না। এবার চিনতে পারলেন আমাকে? অন্তত একটু? একটুও না? আচ্ছা আরও বলছি। একবার জেলে গিয়েছিলাম, তেরঙ্গা নিশান হাতে করে, আরও অনেকের সঙ্গে, একছড়া মালাও পেয়েছিলাম, কে-একজন, মুখখানা আজ আর মনে নেই, হাসিটি মনে আছে, আর সোনার বালা পরা হাতখানি, কপালে রক্তচন্দনের তিলক পরিয়ে দিয়েছিল। এবার চিনতে পারছেন আমাকে? এখনও না? আপনাদের একজন বলে মনে হচ্চে না একটুও? কি ক'রে হবে? আমি তো আপনারা নই! আপনারা কারা? আমি চিনি আপনাদের? চিনলে কি দাঁড়াতে পারতাম আপনাদের সামনে? আমি আপনাদের, আপনারা আমাকে, আমরা কেউ কাউকে চিনি না। কি মজা! আসামী হাজির। আপনারা তাকে চিনতে পর্যন্ত পারছেন না।

[উত্তেজিত] সরে যা, সরে যা, ভাগ, ভাগ। তুই আমার ধারে কাছে আসিস নে। তুই তো নেই! মরে গেছিস! তার চেয়েও খারাপ।

তোকে মেরে ফেলেছে। বেঁচে থাকবার মতো সামান্য শক্তিও তোর ছিল না! ছ্যাখ তো, আমি এখনও কি সুন্দর বেঁচে আছি! মরে গেলি কেন? মেরে ফেলতে দিলি কেন? মূর্খ হতচ্ছাড়া, গাধা। অমনি ক'রে মরে যায় কেউ? ঐ বয়সে? অমনি ক'রে রাস্তার ওপরে, মুখ থুবড়ে, অন্ধকারে মরে থাকে কেউ? ছি, ছি, ছি। সরে যা, সরে যা, আমার ধারে কাছে আসিস নে। ভাগ্।

আমার একটা বৌ ছিল। পরনে বঙ্গলক্ষী শাড়ি, কপালে সিঁদুর। রীতিমতো জ্যান্ত তরতাজা বৌ। চিমটি কাটলে চেঁচিয়ে উঠত, কাতুকুতু দিলে হেসে ছটপট করত, বকলে মুখ ভার হত, প্রশংসা করলে মুখখানা রঙিন দেখাত। শরীর নরম ছিল, গরম ছিল, রীতিমতো জলজ্যান্ত বৌ ছিল আমার একটা। আমাদের প্রেম ছিল। রীতিমতো কথামালার প্রেম। বৌ আমাকে ভীষণ ভক্তি করত। আপনারা যেমন করেন আপনাদের স্বামীদের। রেগে মেগে একদিন শিলনোড়ার শিলটা ছুড়ে মেরেছিল, আমার পায়ের ওপর পড়ে রক্তারক্তি হয়েছিল আর তাই দেখে বৌএর কি কান্না? প্রেম ছিল আমাদের খুব। কথামালার প্রেম।

[উত্তেজিত] তোর দোষ নেই বলছিস! তবে দোষ কার? তুই কুড়ি বছর বয়সে মরে গেলি আর দোষ নেই তোর? মেরে ফেলল তোকে! মেরে ফেলতে দিলি? কৈ? অসুখ বিসুখ তো তোকে মারতে পারে নি? যমের সঙ্গে আমি লড়তে পারলে যম তোকে তুলে নিতে পারত? এসপার ওসপার ক'রে দিতুম না? তোকে রাত্রের অন্ধকারে নির্জন রাস্তায় একটা লোক গুলি ক'রে মারল, আর তুই মরে গেলি? আমাকে একটা চান্স দিলি না তোকে বাঁচাবার? যার সঙ্গে লড়বি তাকে মেরে ফেলার সুযোগ দিবি কেন? বেঁচে না থাকলে লড়বি কি ক'রে? মরলি তো মেরে মরতে পারলি নে? কেবল একা একা বোকার মতো মরে গেলি!

সরে যা, সরে যা, ভাগ্। আমার কাছে এসে কৈফিয়ত দিস নে। ভাগ্।

ছেলেটার একেবারে বুদ্ধি ছিল না। তাজা জীয়ন্ত ছেলে। চোখভরা আকাশ। বুকভরা সমুদ্র। যখন তাকাত, মনে হত আকাশ চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। লক্ লক্ ক'রে বেড়ে উঠেছিল। লাউ-এর ডগার মতো। কেবল আলো চাই আলো, আলো, আলো। আলোর আকাঙ্ক্ষায় হাত পেতেছিল, কার কাছে? বিরাট। বহুরূপী পোকা। মুহূর্তে মুহূর্তে তার রং বদলায়। ছেলেটা কেবল একটা রংই দেখতে পেয়েছিল, বাকীগুলো পায় নি। পোকা মানুষটা দেখল, বেশ একটা তরতাজা ছেলে পাওয়া গেছে, মজিয়ে রসিয়ে কাজে লাগানো যাবে। ছেলেটা আটকে গেল মাকড়সার জালে। আর রেহাই নেই। তারপর একদিন যা ঘটবার তা ঘটল। ছেলেটা বুঝতে পারল, জানতে পারল, দেখতে পেল। প্রদীপের নিচে গাঢ় অন্ধকার। দেখে, বোকা ছেলে, ক্ষেপে গেল। আমাকে ঠকাল কেন? মূর্খ। এ দুনিয়ায় কে না কাকে সর্বদা ঠকায়? ঠকঠকে জীবনে ঠকানো ছাড়া কি আছে আর? এ অতি সরল সত্য, কিন্তু ছেলেটা বুঝল না। ভূত চেপে বসল ওর ঘাড়ে। বিরাট লোকটার আসল চেহারা উদ্‌ঘাটিত করতে হবে সবার সামনে। খুলে ফেলতে হবে মুখোশ, ন্যাংটো ক'রে হাটেবাজারে দেখাতে হবে বিরাট পোকাটা আসলে মানুষ নয়, পোকাই। ভেবে দেখুন, এমন বুদ্ধিনাশ কখনো ঘটে কারো? তুই পারবি কেন ওর সঙ্গে? তুই তো একা, এক পুঁটকে ছোকরা, হোক না তোর চোখ আকাশ-আকাশ, থাক না তোর বুকে একখণ্ড সমুদ্র! ওরা, ঐ পোকাগুলো তো অনেক, ওদের দল ভারী, দেশ থেকে দেশান্তরে বিস্তৃত। অনেক বোঝালুম, লড়তে মানা করি নি আমি, কখনও না। লড়তে তো হবেই, না লড়লে বেঁচে থেকে লাভ কি

বলুন ? কিন্তু তুই একা লড়বি কি ক'রে ? তোর ফৌজ কই, অস্ত্র কই, রসদ কই ? তোকে মিত্র খুঁজে বার করতে হবে না ? শত্রুকে যদি চিনিস, মিত্রকে চিনে নিতে হবে না ? শত্রুর শক্তির পুরো হিসেব রাখতে হবে না ? বুঝে নিতে হবে না তার রণনীতি, রণ-কৌশল ? খুঁজে বার করতে হবে না তার দুর্বলতা, কোথায় সে কম-জোর, কোথায় আঘাত করলে সে কাবু হতে বাধ্য ? ছেলেটা এসবের ধারকাছ দিয়ে গেল না। ভাবল একক শত্রুর সঙ্গে একা লড়বে, প্রকাশ্যে দিবালোকে, বলল, লক্ষ্য ও পথের অমিল হলে লক্ষচ্যুত হওয়া অনিবার্য ! আরে, এ তো ঐ পোকাদের হিতবাণী ! তোদের মন ভোলাবার জন্যে ঐ পোকারা সর্বদা হিতবাণী উচ্চারণ করে। ওরা যা বলে আর যা করে, তার মধ্যে দূরত্ব হল কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী। কথায় বলে প্রেমে আর রণে কোনও কিছুই অন্যায় নয়, অন্যায় একমাত্র পরাজয়। হেরে গেলে তো সব গেল। দেখছিস না যুদ্ধ লাগলে উভয় পক্ষই বলে ঈশ্বর তার সঙ্গে, আর শত্রুর সারথি আসল শয়তান! কিন্তু লাভ হল না। অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু বুঝল না ছেলেটা। বিরাট পোকাটার পেছনে লাগল। একা, একা। ফলও পেল! একটা বড় কিছু আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিল। বলে নি সবটা আমাকে। কোন যেন একটা মেয়েকে পেটে-বাচ্চা ক'রে দিয়েছিল পোকাটা। বুঝিয়েছিল বিয়ে করবে। পরে মোক্ষমসময়ে ল্যাং মেরে সটকে পড়েছিল। এ রকম কোন একটা কিছু, ঠিক মনে নেই আমার। শুনে আমার হাসি পেয়েছিল। মেয়েদের পেটে বাচ্চা ক'রে দেওয়া এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়। সব পোকারাই সব পোকানীদের পেটে বাচ্চাপোকা তৈরি করছে। ছোটপোকারা সমাজের নিয়মকানুন মেনে করছে, বিরাট পোকাদের বেলা নিয়ম মানার প্রয়োজন নেই। আমি বললুম, অন্য কিছু খুঁজে বার কর। দেখতে পাবি বিরাট

পোকাটা নিশ্চয় ডজন খানেক বাড়ি কিনেছে, হাজার বিঘে জমি গিলেছে, বিশটা কোম্প্যানীর গাদা গাদা শেয়ার সামলেছে। কিন্তু তখন ট্যু লেট। আবিষ্কারের নেশায় ছেলেটা পাগল। কিন্তু লাভ কি হল ? বিরাট পোকাটা টের পেয়ে গেল তুই কি তালে আছিস, কি জানতে পেরেছিস, কতটুকু প্রমাণ হাত করেছিস। তোকে একবার ছুবার লোভ দেখাল। টললি না। তারপর ভয় দেখাল। টললি না। তারপর তোর সঙ্গে চূড়ান্ত রসিকতা ক'রে বসল। মেরে ফেলল তোকে। সদর রাস্তায়, এক রাত্রে, আকাশ ভরা তারা ছিল, একাদশীর চাঁদ ছিল, তোকে ধাওয়া ক'রে রাস্তার ওপর গুলি ক'রে মেরে ফেলল, তুই বোকার মতো মরে গেলি, তোর কথাটি ফুরাল, নটে গাছটি মুড়াল।

পোকার নাম মানুষ, আশার নাম ফানুস। জল পড়ে পাতা নড়ে। ঘরে ঘরে লোক বাড়ে। ঘরে ঘরে লোক মরে। বড় পোকারা ছোট পোকাদের সব খেয়ে ফেলছে। সাবধান, বুঝলেন ? সাবধান।

[মঞ্চে অন্ধকার নামল। এবার যখন আলো জ্বলবে, দেখা যাবে সূর্য-প্রতিম চৌধুরী চেয়ারে বসে প্রেস কন্‌ফারেন্স নিচ্ছেন। তাঁর মুখের সামনে মাইক, পেছনে তিনজন সহকারী (aides) কাগজপত্র নিয়ে প্রস্তুত। সাংবাদিকগণ হলেন দর্শকবৃন্দ, প্রশ্ন তাঁদের মধ্য থেকেই উচ্চারিত হবে, অন্তত তাই মনে হবে। পরিচালক টেপ রেকর্ডে প্রশ্নগুলি মঞ্চের বিপরীত কোণ থেকে নিক্ষেপ করবেন, তাতে মনে হবে দর্শকদের কেউ কেউ প্রশ্ন করছেন।]

সূর্যপ্রতিম। আমার ঘোষণা তো আপনারা শুনলেন। এবার আমি আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেব। আমার প্রেস কন্‌ফারেন্সের কয়েকটি নিয়মকানুন আছে, সেগুলো আপনাদের মেনে চলতে হবে।

[সূর্যপ্রতিমের নির্দেশে অন্যতম সহকারী নিয়মগুলি সাংবাদিকদের জানিয়ে দেবেন]

সহকারী। এক এক সাংবাদিক একাধিক প্রশ্ন করিবেন না। উত্তরের পরে প্রতি-প্রশ্ন আগ্রাহ্য। প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত একমাত্র আমার। অসঙ্গত, অশালীন, অসংযত প্রশ্ন অগ্রাহ্য। সংবাদপত্রে রিপোর্ট দিবার পূর্বে প্রশ্নোত্তর আমাকে দেখাইয়া অনুমোদন লইতে হইবে। বাজে প্রশ্ন করিবেন না।

[সূর্যপ্রতিম সাংবাদিকের প্রশ্নের জন্য তৈরী। টেবিলে রাখা এক গ্লাস জলে চুমক দিয়ে তিনি এখন প্রশ্নের অপেক্ষায়]

প্রশ্ন। আপনি আমাদের কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছেন? দক্ষিণে, না বাঁয়ে, না মধ্যমে?

সূর্যপ্রতিম। ঊর্ধ্বে।

প্রশ্ন। কি অবলম্বন ক'রে আমরা ঊর্ধ্বে আরোহণ করছি?

সূর্যপ্রতিম। হাওয়া।

প্রশ্ন। জনসাধারণের ওপর আপনার যে এই বিপুল প্রভাব, এর মূলে কি আছে?

সূর্যপ্রতিম। (বিগলিত হাসিতে) আমূল অপরিবর্তন।

প্রশ্ন। আপনার কাছে কোনটা বেশি বড়—স্থিতি, সংস্কার, সংশোধন না পরিবর্তন?

সূর্যপ্রতিম। সম্প্রতি।

প্রশ্ন। গত নির্বাচনে আপনার বিরাট সাফল্যের কারণ কি?

সূর্যপ্রতিম। গরু।

প্রশ্ন। ধনীরা ক্রমেই ধনী হচ্চে গরীবরা গরীব: এ সমাজব্যবস্থার নাম কি?

সূর্যপ্রতিম। সমাজতন্ত্র।

প্রশ্ন। দ্রব্যাদির দাম হু হু ক'রে রোজ বাড়ছে, এর প্রতিকার কি?

সূর্যপ্রতিম। উপবাস।

প্রশ্ন। গরিবী হটে গেলে কি থাকবে?

সূর্যপ্রতিম। গরীব।

প্রশ্ন। সমাজতন্ত্রে পুঁজিবাদীদের স্থান কোথায়?

সূর্যপ্রতিম। পকেটে।

প্রশ্ন। আপনার মতবাদ কি?

সূর্যপ্রতিম। হিম্মৎবাদ।

প্রশ্ন। বিপ্লব বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায়?

সূর্যপ্রতিম। যা যেমন আছে, তাই।

প্রশ্ন। আমাদের গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি কি?

সূর্যপ্রতিম। স্তন্যপায়ী বাছুর।

প্রশ্ন। কলিকাতা নগরীর ভবিষ্যৎ কি?

সূর্যপ্রতিম। সজ্ঞানে কাশীপ্রাপ্তি।

প্রশ্ন। বর্তমান বিপ্লবে তরুণদের আপনি কি ভূমিকা অর্পণ করেছেন?

সূর্যপ্রতিম। বে-নামভূমিকা।

প্রশ্ন। বর্তমান বিপ্লবে ভূমিসংস্কারের স্থান কি?

সূর্যপ্রতিম। প্রস্থান।

প্রশ্ন। বর্তমান কালে কোন পদার্থকে অপিয়াম অব দি মাসেস বলা যায়?

সূর্যপ্রতিম। সংবাদপত্র।

প্রশ্ন। পিপ্‌ল বলতে আপনি কি বোঝেন?

সূর্যপ্রতিম। ফুটবল।

প্রশ্ন। আপনার বৈদেশিক নীতি কি?

সূর্যপ্রতিম। স্বদেশ।

প্রশ্ন। ভারতের রাজনীতি সবচেয়ে ভাল বোঝেন কারা?

সূর্যপ্রতিম। জ্যোতিষীরা।

প্রশ্ন। বাঙালীপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোনটা ?

সূর্যপ্রতিম। কলিকাতা নিঃস্ববিদ্যালয়।

প্রশ্ন। বাঙালীপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ কিসে ?

সূর্যপ্রতিম। খতম।

[সূর্যপ্রতিমের প্রেস কন্‌ফারেন্স এখানে শেষ হল। মঞ্চকে অন্ধকার ক'রে দেবার সঙ্গে সঙ্গে টেপ রেকর্ডে করতালি বাজবে, যদি দর্শকরা নিজেরাই করতালি না দেন, অর্থাৎ দিতে ভুলে যান। এর পরে আলো পড়বে পার্কে। সুন্দর সোনালি সকাল। অনুভূতি দর্শকদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। তার পরনে সাধারণ শাড়ি, চুল খোলা, মুখে চোখে আনন্দিত উত্তেজনা। অনুভূতির 'মনোলগে' আত্ম-আবিষ্কারের আনন্দ।]

অনুভূতি। আমার কাছে, জানেন, সব চেয়ে বিস্ময়কর, অবাককরে-দেওয়া ঘটনাটা হল : আমি। এক এবং অদ্বিতীয় রহস্য, সৃষ্টির প্রথম থেকে আমি, শেষ পর্যন্ত আমি। আমি আছি, তাই পৃথিবী আছে, চন্দ্রসূর্যতারা আছে, আছে প্রকৃতির অশেষ বৈভব, আছেন আপনারা, আমি না থাকলে সব শূন্য অন্ধকার। তাই, জানেন, আমি অনেক বড়, অনেক, অনেক, আকাশ আর সমুদ্র মিলিয়ে যা, তার চেয়েও বড়, ঈশ্বর আর সৃষ্টি মিলিয়ে যা তার চেয়েও। এত বড় আমাকে নিয়ে কি যে করব বুঝে উঠতে পারি নে। আমাকে আমি সামলাতে পারি নে। আমার কাছে কোনও ঘটনার মানে নেই, মানে আছে কেবল আমি কিভাবে কোন ঘটনার দ্বারা কতখানি আন্দোলিত হচ্ছি, প্রস্ফুটিত, বিকশিত। আমাকে আমি ধরে রাখতে পারি নে, এ যে বিরাট শক্তি, হাজার আণবিক বোমার চেয়েও শক্তি বেশি আমার, আমি যে মানুষ! কেউ যদি কোনওদিন আমার জীবনী লেখে তাহলে সে দেখতে পাবে আমার জীবন কেবল কতকগুলি ঘটনার পঞ্জী নয়, অনেক আবেগ, অনেক

প্রবাহ, অনেক বিস্ফোরণের ফুলে-ফুলে-ওঠা কাহিনী। শৌনিক একদিন জীবনকে নদীর সঙ্গে তুলনা করেছিল, ডাক্তার হলে কি হবে, বাঙালী তো, ওর মধ্যেও একটা শুকনো-গাল শীর্ণদেহ কবি আছে। জীবন যদি নদী হয়, আমি প্লাবন, কেবল বন্যার উচ্ছ্বাস আমার বুকে। আমি কেবল চলে যেতে চাই, ঝড়ের মতো, জেট-প্লেনের মতো। তিস্তার বন্যা দেখেছেন? ব্রহ্মপুত্রের প্লাবন? তাহলে আমাকে চিনতে পারবেন কিছুটা। আসলে কি জানেন, বেঁচে থাকাটা এক চরম পরম দুর্দান্ত অনুভূতি। বিরাট উন্মুক্ত বিস্ময়। মনে হয় না আপনাদের? বেঁচে আছি, বেঁচে আছি, বেঁচে আছি, আঃ কি চমৎকার! মনে হয় না? ফুলের সৌরভ নাকে আসছে, সঙ্গে অবশ্য পচা নর্দমার গন্ধও, ভাল ভাল খাবার আস্বাদ করতে পারছি, বুকে আনন্দ হচ্ছে, আবার দারুণ ব্যথা, ভালবাসতে পারছি, পারছি ঘৃণা করতে, ভাবতে পারছি, চিন্তা করতে, ন্যায়-অন্যায় বুঝতে, লড়তে পারছি, স্বপ্ন দেখছি, অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের অনুভূতি, ভবিষ্যতের স্বপ্ন সব আমার অধিকারে, এটা কি পরম বিস্ময় নয়, আমি তো এ বিস্ময়ে ডুবে আছি, ডুবে আছি, ডুবে আছি। এ কি পরম বিস্ময় নয় যে আমার এই বুক থেকে, মন থেকে বেরিয়ে আসছে নতুন নতুন চিন্তা, একের পর এক তরঙ্গ, আর আমি কেবল উদ্‌বেলিত হচ্ছি, উচ্ছ্বাসে উপচে পড়ছি, আমার যেন শেষ নেই, আমি অসীম, অনন্ত, আমার কাল নেই, আমি চিরকাল।

শৌনিক কিন্তু অন্যরকম। ছেলেটা, মানে লোকটা, ভাল। কি বলেন আপনারা? দেখতে শুনতে ভাল নয়? ভাল লাগে নি আপনাদের ওকে? লাগবেই। আমি ওকে অনেকদিন ধরে জানি, তা আজ চার বছর তো হবেই। তখন ও মাত্র ডাক্তারী পাস ক'রে বেরিয়েছে। আর আমি, আমি এখনও যা, তখনও তা, বাউণ্ডুলে কোনও-

কাজের নয় কেবল হাসিখুশি কেবল বন্যা আর বন্যা। আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ এবং আলাপ এ শহরেরই একটা বস্তিতে। শৌনিক ডাক্তারী পাস ক'রে শেয়ালদর কাছে একটা বস্তিতে প্র্যাকটিস করতে বসেছে, প্রতি রুগীর কাছ থেকে এক টাকা দক্ষিণা নেয়, ওর ইচ্ছা বস্তিবাসীদের চিকিৎসা ক'রেই জীবন কাটিয়ে দেবে। আমি তখন লেডী করুণা বসুর উদ্বাস্তু নিকেতনে সপ্তাহে তিনদিন বিনে মাইনেয় কাজ করি, কাজ মানে উদ্বাস্তুদের জন্যে জামাকাপড় কিছু টাকাপয়সা সংগ্রহ। আমাদের নিকেতনের একটি মেয়ে বাস করত শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে এক বস্তিতে, সে অসুখে পড়ল, তার বস্তিতে গিয়ে দেখি শুয়ে কাৎরাচ্ছে, যা খাচ্ছে তাই বমি হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার দেখাতে হবে, পাশের বস্তিতে খবর পেলাম বস্তির মধ্যেই একজন 'ভদ্রলোক' ডাক্তার আছেন। তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম মেয়েটিকে। সে ডাক্তারই এই শৌনিক, যাকে আপনারা দেখেছেন। মেয়েটিকে দেখে-টেখে শৌনিক আমাকে বলল :

[এখানে হঠাৎ মঞ্চ অন্ধকার হয়েই আলো জ্বলবে। দেখা যাবে শৌনিক আর অনুভূতি কথা বলছে।]

শৌনিক। আপনি মেয়েটিকে জানলেন কি ক'রে ?

অনু। মানুষ মানুষকে যে ভাবে জানে।

শৌনিক। কি ভাবে ?

অনু। অল্পস্বল্প, পাকে প্রকারে হঠাৎ, প্রায়ই অ্যাসিডেণ্টে।

শৌনিক। আপনার আত্মীয় নয় তো ?

অনু। নিশ্চয়।

শৌনিক। [অবাক] কিরকম আত্মীয় ?

অনু। ঘনিষ্ঠ।

শৌনিক। পিসি, দিদি, মা-মণি ; কি হয় আপনার মেয়েটি ?

অনু। ওসব কিছু নয়।

শৌনিক। তাহলে আত্মীয় বললেন যে ?

অনু। মানুষ তো! মানুষে মানুষে—

শৌনিক। অ। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা! কি বলেন ?

অনু। আসলে তাই নয় কি ? মানুষ না হলে তো আর আত্মীয় হতে পারে না ? পারে ?

শৌনিক। আপনি বেশ বাজে বকতে পারেন।

অনু। তা পারি।

শৌনিক। আমার প্রশ্নের জবাবের অপেক্ষায় আছি।

অনু। আপনার বুঝি বিশেষ রোগীপত্তর নেই ?

শৌনিক। থাকবে না কেন ?

অনু। কাউকে দেখছি না কিনা, তাই। তাছাড়া একটি রোগীর পেছনে এবং তার সঙ্গীর পেছনে, এত সময় নষ্ট করার মানে—

শৌনিক। আমি ডাক্তার, ব্যবসায়ী নই।

অনু। আপনিও বেশ বাজে বকতে পারেন।

শৌনিক। আমি ডাক্তার নই!

অনু। রাগছেন কেন, আমি কি আপনার সার্টিফিকেট দেখতে চেয়েছি ? দেখতে আপনাকে কারখানার কারিগর মনে হলেও বলেছি আপনি ডাক্তার নন ?

শৌনিক। আমি এম বি-বি-এস।

অনু। বিলক্ষণ! ফী কতো ?

শৌনিক। এক টাকা।

অনু। কত ?

শৌনিক। এক টাকা। না থাকলে, পঞ্চাশ পয়সা।

অনু। ডিগ্রীটা আস্ত তো ?

শৌনিক। মানে ?

অনু। বাবার অনেক টাকা আছে?

শৌনিক। বাবাই নেই তো বাবার টাকা!

অনু। বাবা না থেকে বাবার টাকা থাকা বিশেষ আরামদায়ক।

শৌনিক। না, আমার বাবাও নেই, বাবার টাকাও নেই।

অনু। দুবেলা খেতে পান?

শৌনিক। নিশ্চয়। আমাকে দেখে কি ক্ষুধার্ত মনে হচ্চে?

অনু। তা একেবারে হচ্চে না এমন বলতে পারব না।

শৌনিক। যা জানতে চাইছি তাই বলুন, তাহলেই আমি যা বলা দরকার তা বলতে পারি।

অনু। আপনার যা বলার আপনি বলুন, আমি শুনতে রাজী।

শৌনিক। মেয়েটির সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?

অনু। মানুষ মানুষ।

শৌনিক। বলবেন না। ঠিক আছে। মেয়েটি কে?

অনু। নাম ঠিকানা তো দিয়েছি আপনাকে।

শৌনিক। ওর প্রতি আপনার দায়িত্ব কতখানি?

অনু। এটা কি ডাক্তারখানা, না আদালত? আপনি কি এমবি-বিএস না বারঅ্যাটল?

শৌনিক। দেখুন ব্যাপারটা গুরুতর। আমার এমন কারুর সঙ্গে কথা বলতে হবে যার ওপর মেয়েটির দায়িত্ব।

অনু। বৃদ্ধ বাপ, দুচোখ অন্ধ।

শৌনিক। আর কেউ নেই?

অনু। ভগবান আছেন নিশ্চয়। দেওয়ালে চারটে টিকটিকি।

শৌনিক। তাহলে?

অনু। আমাকে বলুন।

শৌনিক। মেয়েটি প্রেগনেণ্ট।

অনু। তাই নাক?

শৌনিক। মাস চারেক হবে। কোন ওষুধ খেয়ে নষ্ট করবার চেষ্টা হয়েছিল।

অনু। বেচারা।

শৌনিক। এর জন্যে দায়ী কে?

অনু। আমি নই!

শৌনিক। অন্তত একটা কথা এতক্ষণে ঠিক বলেছেন। কিন্তু, কে?

অনু। ঈশ্বর।

শৌনিক। হাতি।

অনু। সত্যি? তাও কি সম্ভব?

শৌনিক। ব্যাপারটা ইয়ার্কির নয়। দায়ী যে তাকে নিয়ে আসুন আমার কাছে।

অনু। সে আসবে কেন?

শৌনিক। আসবে না কেন?

অনু। ডাক্তারদের কমনসেন্স একটু কম থাকে। তা নইলে লোক মেরে পয়সা কামাতে পারে না। এটুকু বুঝতে পারছেন না যে-লোকটি এ অবস্থায় ওকে ফেলে রাখতে পেরেছে, খোঁজখবর নেবার দরকারও বোধ করে নি, তার কেবল আপনার দর্শন পাবার জন্যে এখানে হাজির হবার কোনও সম্ভাবনা নেই!

শৌনিক। তাকে ধরে আনতে হবে। মেয়েটির কাছ থেকে নাম-ঠিকানা জেনে নিন। পুলিশ দিয়ে পাকড়াও করিয়ে নিয়ে আসুন।

অনু। তারপর? জোর ক'রে মেরে ধরে বিয়ে দিন। বিয়ের রাতে লোকটা পালিয়ে যাক। কিংবা সারাজীবন ধরে বৌকে পেটাক!

শৌনিক। তবু সন্তান তো রক্ষা পাবে। তার পিতৃপরিচয় থাকবে।

অনু। তাতে লাভ? এই শহরে লাখ তিনেক ছোকরারা দিনরাত্র রকবাজী ক'রে বেড়াচ্ছে। তারা আজ কংগ্রেস কাল সিপিএম,

পরশু নকশাল। তাদের প্রত্যেকের পিতৃপরিচয় আছে। কিছু লাভ হয়েছে সমাজের, দেশের ?

শৌনিক। এ মেয়েটির দায়িত্ব কে নেবে ?

অনু। কে আর ? ও নিজেই। যা করেছে তাতে ওর দায়িত্ব ছিল না ?

শৌনিক। আপনি ওকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারবেন ?

অনু। হাসপাতালে কেন ?

শৌনিক। বাড়িতে বুড়ো অন্ধ বাপ ওর কি সেবা-শুশ্রূষা করবে।

অনু। করবে নিশ্চয়। তবে মেয়েটা বাঁচবে না।

শৌনিক। আমি গায়নোকোলজিস্ট নই। ওকে একজন গায়নোকোলোজিস্ট দিয়ে দেখানো দরকার।

অনু। কিছু না বুঝেই আপনি এতক্ষণ এতসব বলে গেলেন ?

শৌনিক। ওর অসুখটা কি বুঝতে গায়নোকোলজিস্ট হতে হয় না। প্রেগনেনসি টিকবে কিনা তা আমি বলতে পারবো না। যে টোটকা খেয়ে এ অবস্থায় এসেছে বস্তিতে থাকলে সে টোটকা আর একবার খাবেই, এবং তখন অ্যাবরশন হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। তা না হয় হল, রক্ষা পাবে মেয়েটা, কিন্তু বিপদ-আপদ কিছু ঘটে গেলে বাঁচবে না।

অনু। তাহলে ?

শৌনিক। তাই বলছিলাম, হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন।

অনু। দিন পাঠিয়ে !

শৌনিক। কে ? আমি ?

অনু। রোগী কার ? আপনার না আমার ?

শৌনিক। আপনি তো মশাই ভীষণ লোক !

অনু। এই নিন আপনার ফী। পুরো এক টাকা। এবার রোগীর জন্যে যা দরকার, করুন।

শৌনিক। আপনি কে?

অনু। আমি আমি।

শৌনিক। নামধাম কিছু আছে?

অনু। আমি অনুভূতি।

শৌনিক। কি?

অনু। অনুভূতি।

শৌনিক। তা ঠিক। অনুভূতি। তা ঠিকই।

[মঞ্চ হঠাৎ অন্ধকার হয়ে, পুনরায় আলোকিত। অনুভূতি একা।]

অনুভূতি। শৌনিকই মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটা বাঁচে নি। মরে গেছল। শরীরে রক্ত ছিল না একটুও। কি সব খেয়েছিল, তাতে অ্যাবরশন হয়ে গেল, পেটের বাচ্চার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাও মরল। বুড়ো অন্ধ বাপ কিন্তু কাঁদে নি একটুও। বরং বার বার বলেছিল, ভালই হল, এবার আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব। আমি কিন্তু ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম। সক্কলের ওপর। মেয়েটার ওপর, ওর পেটে যে বাচ্চা ক'রে দিয়েছিল সেই অজানা লোকটার ওপর, বাচ্চাটার ওপর, সমাজ ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থার ওপর, ভগবানের ওপর। দুটো প্রাণ এমনি ক'রে ফুরিয়ে গেল? ফুরিয়ে গেলেই হল? জীবনটা কি এতোই সামান্য, এমন মূল্যহীন? এই যে আমি বেঁচে আছি, কি আশ্চর্য সুন্দর ঘটনা, আমি মরে গেলেই হল? জুলুমবাজী পেয়েছ? ইয়ার্কি? বেঁচে থাকবার অধিকার নিয়ে জন্মেছি বলেই তো আমি মানুষ। আমাকে মেরে ফেলবার অধিকার দেয় নি তোমাকে কেউ, না আমি, না ভগবান। বেঁচে থাকবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত নয় যে সমাজে তা মানুষের সমাজ নয়, নয়, নয়। কি জানেন, সেই বাচ্চা-পেটে মেয়েটার মরে যাওয়া থেকে আমার মধ্যে রাগটা রয়েই গেছে, সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়, যা আমি সহজে

বাইরে স্বীকার করতে চাইনে, অথচ সব সময় বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখি। ভয়টাকে ভাষায় প্রকাশ করা সহজ নয়, তার চেহারাটা ঠিক চিনতে পারিনে, ছায়া-ছায়া, ভূত-ভূত, ভাবলে গা শিরশির করে, রোম খাড়া হয়ে ওঠে। আমি বেঁচে থাকতে এতো ভালবাসি, অথচ আমার বেঁচে থাকবার বিরুদ্ধে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র মাকড়সার জাল ছড়িয়ে আছে, এই হল আমার ভয়ের চেহারা। ষড়যন্ত্রটাকে আমি দেখতে পাই নে, ঠিক চিনি নে, পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিতে পারব না, আমি জানি ওটা আছে, আমার সঙ্গে সঙ্গে, আমার চারদিকে, ছায়ার মতো। ষড়যন্ত্রটা কি বুঝতে পেরেছেন ? পারেন নি ? নিশ্চয় পেরেছেন। অন্তত আপনাদের মধ্যে যাদের কাছে বেঁচে থাকাটা টিকে থাকার সমার্থ নয়, বেঁচে থাকা মানে, বেঁচে-যে-আছি তা সর্বদা অনুভব করা, একটা ধারাবাহিক শিহরণ, আনন্দের অথবা ব্যথার শিহরণ। ষড়যন্ত্রটা হল আপনাকে বাঁচতে না দেবার, আপনাকে বেঁধে-ছেঁদে, কেটে-ছেঁটে ছকে ফেলে নিয়মমাফিক ক'রে নেবার, যাতে আপনাকে কণ্ট্রোলে রাখা যায়, আপনি একটা প্রবলেম না হয়ে দাঁড়ান। পরিবার বলুন, স্কুলকলেজ বলুন, সংবাদ-পত্র বেতার বলুন, নেতাদের চব্বিশ ঘণ্টা চড়চড় চেঁচানি বলুন, গুরুঠাকুর বলুন, দেবদেবীভগবানঈশ্বরআল্লাহ বলুন, সব কিছু নিয়ে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র, যাতে আপনি বেনিয়ম কিছু না হয়ে বসেন, যাতে আপনি অনেক অনেক অনেক অনেক মেষমানুষের একটি হন। ছোটবেলা থেকে আপনার ব্রেনওয়াশ শুরু। সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি। আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে, আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে। ব্যস। ষড়যন্ত্রের শুরু। খোকা হয়ে থাকো, বাবা-বাছা, সারাজীবন ! মায়ের খোকা, বাবার খোকা, কাকাপিসিমাসিমামামামীজেঠাজেঠির খোকা, স্কুলে মাস্টারমশাইর খোকা, কলেজে অধ্যাপকের, দপ্তরে

বড়বাবু অথবা বড়সাহেবের, ঘরে স্ত্রীর—সেও কিন্তু আজীবন খুকি—সরকার বাহাদুরের খোকা, জমিদারজোতদারদের খোকা, কারখানার মালিকদের খোকা, খোকা হয়ে জন্মেছ, একদিন খোকা হয়ে, ভাল ছেলের মতো সরে যাও, তোমাকে নিয়ে কিছু প্রবলেম নেই। এই হল ষড়যন্ত্রের চেহারা। সুশীলসুবোধসুসভ্য মেষমানুষ। কিন্তু বেঁচে থাকা? আচ্ছা, আপনার কথাই বলুন। দেখে মনে হচ্ছে আপনি একজন যাকে বলে সাকসেসফুল মহাশয়। কোথায় চাকরি করেন —আই. সি. আই. না লিভর ব্রাদার্স, না ইণ্ডিয়ান অকসিজেন। মাইনে কতো—আড়াই হাজার, চার হাজার? চকচকে অ্যামবাসাডর গাড়ি। থাকেন নিউ আলিপুরে, অথবা যোধপুর পার্কে? দিল্লী গেলে ওঠেন ওবেরয় ইনটারকনটিনেনটালে, বোম্বে গেলে তাজে, এর পরে উঠবেন ওবেরয়-হিলটনে, বিল মেটায় কোম্পানী! প্রতি সপ্তাহ শেষে সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে ক্যালকাটা ক্লাবে আহারবিহারে যান, অথবা বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে? তিন লাখ টাকার ইনসিওরেন্স করেছেন? ছেলেটি পড়ছে ক্যালকাটা বয়েজে আর মেয়েটি গোখলে? বেশ আছেন, না? আরামে আছেন, তাই না? গাড়ি হাঁকিয়ে আসেন যান যখন লক্ষ লক্ষ লোক হাতের মুঠোয় প্রাণটি কোনও মতে ধরে বাসের পেছনে ঝুলতে ঝুলতে একই লক্ষ্যস্থানে যাচ্ছে, ড্রয়িংরুমে আড্ডায় বসে আপনিও তো সোসালিস্ট, তাই না? কিন্তু, বেঁচে আছেন কি? এমন কিছু জীবনে করেছেন যা আপনাকে বেঁচে থাকার থ্রিল দিয়েছে, মনে হয়েছে হঠাৎ বড় হয়ে গেছেন, আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছেন, সমুদ্র আর আপনি দুই সহোদর! গোল্ড ফ্লেক ফুঁকে ইয়েস-স্যার, সারটেনলি-স্যার ক'রে বেশ টিকে আছেন, বেঁচে থাকা কাকে বলে টেরও পেলেন না, আহা বেচারা। আসলে কিন্তু আপনাকে আর ঐ যে ভদ্রলোককে দেখছেন, ওঁতে, কোনও তফাত নেই। ওঁর মাসকাবারে চারশ টাকা রোজগার, ঘরে আধডজন

পেট বাস করেন পাতিপুকুর ছুই নম্বর গলির তেত্রিশ বাই ন' নম্বর বাড়ির তিন তলার একখানা ঘরে, সকালে উঠে এককাপ চা খেয়ে থলি হাতে বাজারে ছোটেন, ফিরে আসেন গাভর্তি ঘাম আর বুকভরা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে, গোগ্রাসে কোনও মতে কিছু গিলে দৌড়ে গিয়ে বাসের এক কোণ-খামছা ধরে মা-ছুর্গা বলে ঝুলে পড়েন, বিকেলে আবার তারই পুনরাবৃত্তি ক'রে ঘরে ফেরা, রাত্রিতে অভ্যাসমতো স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম, এবং ঘোলাটে তরল ঘুম। উনিও নিয়মমাফিক টিকে আছেন, আপনিও। ওঁর নিয়মে উনি, আপনার নিয়মে আপনি। আপনাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান তৈরি ক'রে কর্তারা শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন, বেশ চলছে, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, চলছে বেশ। কিন্তু বেঁচে থাকা? জীবনের উত্তাপ, আনন্দ, উচ্ছ্বাস? নতুন দিগন্তের সন্ধান, আবিষ্কার,—পুরাতনকে নতুন ক'রে তৈরি করবার উত্তেজনা? রুখে দাঁড়ান! বলতে পারা: না মানি না! বলতে পারা, আমি! সবার ওপরে আমি! আমি চাই, চাই, চাই—সুন্দর, পবিত্র, আনন্দিত জীবন। [হঠাৎ অন্ধকার হয়ে আলো জ্বলবে। শৌনিক ও অনুভূতি খুব ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে। চোখে চোখ।]

শৌনিক। ভালবাসি তোমাকে।

অনু। আমিও তোমাকে।

শৌনিক। তুমি সুন্দর। তুমি সীমাহীন। তুমি

অনু। তুমি সুন্দর। তুমি আকাশ। তুমি

শৌনিক। আমি তোমাকে চাই।

অনু। আমিও তোমাকে।

শৌনিক। আমার সবটুকু তোমাকে দিতে চাই।

অনু। আমার সবটুকু তোমাকে।

শৌনিক। তোমার মধ্যে আমি হারিয়ে যেতে চাই। খুঁজে পেতে চাই তোমাকে।

অনু। আমিও তোমাকে।

শৌনিক। ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি।

অনু। আমিও তোমাকে।

[অন্ধকার এবং আলো। অনুভূতি একা দর্শকদের মুখোমুখি]

অনুভূতি। শৌনিক আমাকে প্লাবিত করেছিল, আমি হয়েছিলাম বন্যা বন্যা, বন্যা। সে কি আনন্দ, কি ব্যথা, কি উন্মাদ অনুভূতি! কি সুখ! [খুব আস্তে, শান্ত স্বরে] ভালবাসা মানে কি? ফুটে ওঠা, ফুলে ওঠা, তাই না? উপলব্ধি করা যে হঠাৎ কেমন যেন বিরাট হয়ে গেছি, তাই না? দেহ, ঘর, দেশ, পৃথিবী আমাকে আর ধরে রাখতে পারছে না, সব ছোট হয়ে পায়ে আটকে বসছে, দম বন্ধ ক'রে দিচ্ছে, তাই না? তাহলে? ভালবেসে কি আমরা নিজেদেরই নতুন ক'রে আবিষ্কার করি না? ভালবাসা কি জীবনকে আমাদের সামনে ফুটিয়ে তোলে না?

আমারও তাই হয়েছিল। শৌনিক কিন্তু শেষ রাখতে পারল না। বস্তি ছেড়ে ও তখন ভদ্রপাড়ায় প্র্যাকটিস করছে। ফী বাড়িয়ে করেছে পাঁচ টাকা। রোজগারপত্র মন্দ হচ্চে না। কিন্তু মনের মধ্যে শৌনিকের গোলমাল বেধে গেছে। শৌনিক ষড়যন্ত্রের হাতে ধরা পড়েছে। নিয়মের কাছে হার মানতে শুরু করেছে। আর যতই হারছে ততই আমার ওপরে নির্ভরতা বাড়ছে, শৌনিক ভুলে গেছে জীবনের আনন্দরস আসে প্রত্যেকের নিজের মধ্য থেকে, বাইরে থেকে নয়। বারুদ যদি থাকে তবেই আগুন তাকে জ্বালিয়ে দিতে পারে। আপনার মধ্যেই যদি জীবনের বারুদ না রইল, কেউ জ্বালাতে পারবে না আপনাকে। দিতে পারবে না বেঁচে থাকবার অমৃত আস্বাদ।

[অন্ধকার, এবং আলো। শৌনিক বসে আছে পার্কের বেঞ্চিতে। দুহাতে মুখ ঢেকে। অনুভূতি একটু দূরে দাঁড়িয়ে। এবার দুজনের

বাক্যালাপে বেশ কিছু নীরবতার ব্যবহার থাকবে। নীরবতা কথা কইবে অনেক বেশি বাক্য অথবা শব্দের চেয়ে।

শৌনিক। ধ্যেৎ।

অনু। দরকার ছিল কি সত্যি ?

শৌনিক। টাকা।

অনু। হুঁম।

শৌনিক। সবাই করে। কে না করে ?

অনু। কেউ কেউ।

শৌনিক। সবাই।

অনু। অনেকে।

শৌনিক। কিসসু হবে না। যা আছে, যেমন আছে তাই থাকবে।

অনু। অতএব, বৎসগণ···!

শৌনিক। তার চেয়ে ভিড়ে যাওয়া ভাল।

অনু। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া।

শৌনিক। ভাল নয় ?

অনু। বাছারা সব ভাল থাকো, সুখে থাকো।

শৌনিক। ধেত্তরি।

অনু। ঐ শব্দটা তোমার গল্পের নাম।

শৌনিক। তুমি।

অনু। কি ?

শৌনিক। আমার গল্পের নাম।

অনু। তুমি তো ক্রমেই বেনামী হয়ে যাচ্ছ।

শৌনিক। অনেকের একজন।

অনু। রিজেক্ট।

শৌনিক। অ্যাঁ ?

অনু। রিজেক্ট। প্রয়োজন নেই।

শৌনিক। আমার আছে। তোমাকে।

অনু। আমার নেই। অনেকের একজনকে

শৌনিক। আমরা সবাই তো তাই।

অনু। সবাইকে আমার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন একজনকে।

শৌনিক। আছে কোথাও সে?

অনু। অন্তত একজন আছে!

শৌনিক। কে?

অনু। আমি।

শৌনিক। সঙ্গে আমি।

অনু। পিছিয়ে পড়ছ যে!

শৌনিক। কে?

অনু। বস্তি ছাড়লে কেন?

শৌনিক। বাজে।

অনু। কেন?

শৌনিক। যে সমাজের চারভাগের তিনভাগ বস্তি, সে সমাজই বাজে।

অনু। ভদ্রলোকদের কাজে লাগাতে পারছ?

শৌনিক। ভদ্রলোকরা আরও বাজে।

অনু। তুমি।

শৌনিক। তুমি ছাড়া আমি একেবারে বাজে।

অনু। [হঠাৎ উত্তেজিত] শৌনিক, তুমি পথ হারিয়েছ। তুমি পা দিয়েছ টিকে থাকার পথে। এ পথের শেষে কি আছে জান? আছে সূর্যপ্রতিম চৌধুরীদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে সুখে-থাকা। এ পথ জীবনের পথ নয়। আমার পথ নয় এ পথ।

শৌনিক। [উত্তেজিত] তোমার পথ বলে কিছু নেই। তুমি তা বুঝতেও পারছ না। তুমি কেবল কথা আর ভাবের মোহে আচ্ছন্ন।

তোমার মাথা ঠিক নেই। তুমি পাগল। তুমি অলীক। তুমি তুমি তুমি

[মঞ্চ এবার মিনিট খানেকের জন্যে অন্ধকার হবে। তারপর আলো জ্বলবে ডান দিকে মণিমুকুলের শোবার ঘরে। মণিমুকুল সেজেগুজে কারুর প্রতীক্ষায় ছটপট করছে। ছটপট করার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলছে। কথাগুলি তার মনের অস্থিরতা প্রকাশ করছে]

মণিমুকুল। তিনটে বেজে দশ। আসবার কথা ছিল একটার সময়। "বড় জোর দেড়টা।" তিনটে বেজে বারো। ঘড়িটা ঠিক আছে কিনা কে জানে? এক সপ্তাহ মেলান হয় নি। রোজ দু'মিনিট ফাস্ট যাবার অভ্যাস। তবু তো তিনটে নিশ্চয় বেজেছে। কেমন যেন ভয় ভয় করে। সেই ছোটবেলা থেকে। প্রথম দেখার সময় থেকে। দেখলেই ভয় ভয়। না দেখলেও। যেদিন প্রথম, বাব্বা, মুখ-চোখের কী চেহারা, কি আগুন চোখে, দেহে কি জ্বালা! একশ'টা বাঘের মতো! "দাও, আমাকে দাও!" "আমার চাই! আমাকে দাও!" না দিয়ে উপায় ছিল? জোর ক'রে আদায় ক'রে নিল। ভয়ে গলা আটকে গিয়েছিল আমার! তারপর যতবার চাইল, ঐ একই "দাও! আমাকে দাও।" যেদিন চলে গেল, সেদিনও কী দাপট! আমি তো ভয়ে এইটুকু "ভেবেছ এমনি ক'রে বেঁধে ফেলবে আমাকে!" "তুমি সাবধান হও নি কেন?" "তোমার দায়িত্ব ছিল না?" বাপ রে! কী তেজ! এতটুকু অপরাধবোধ নেই! "আমার জীবনে অনেক বড় কাজ আছে। তোমাকে বিয়ে ক'রে আট ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে বসে থাকবো ভেবেছ।" না, আমি ভাবি নি। কিছু ভাবি নি আমি কোন দিন। তিনটে কুড়ি মিনিট। এখনও দেখা নেই। "আমি আসছি আজ।" না এলেই তো হয়, একেবারে কখনও না এলে! কি হয়? আমি নিশ্চিন্ত হই? বস্তিতে থাকি? কে? না তো!

আসলে আমি চাই উনি আসুন, অন্তত মাঝে মধ্যে আসুন, লোকে জানুক উনি এখানে আসেন, লোকে জানে উনি আমার কেউ হন! কে হন উনি আমার? অভিভাবক? আমি বেঁচে আছি নিজের তদারকে, আমার অভিভাবক নেই কেউ! গুরু! ফুঁ্যস। আমার গুরু তো কৃপানন্দ মহারাজ, আমাকে 'মা লক্ষ্মী' বলে ডাকেন, "মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী," আমিও কিছু কম করিনে, এই তো আশ্রমের জন্যে গত বছর আট হাজার টাকা তুলে দিলাম! বন্ধু! ওরে বাব্বা! ওঁকে বন্ধু বলবে এমন সাহস কার? উনি কারুর বন্ধু নন। ওঁর কাছে মানুষ হয় মিত্র, নয় শত্রু। কেউ চিরদিনের মিত্র নয়। আজকার মিত্র আগামী কাল শত্রু। কত গলায়গলায়ভাব মিত্রদের উনি বিনা দ্বিধায় ধুলোসাৎ করেছেন তার হিসেব আছে? রাজনীতির নাকি এই নিয়ম। কেউ বন্ধু নয়, ক্ষমতার অঙ্গনে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতিযোগী। উনি কে আমার? নেতা? হ্যাঁ, উনি আমার নেতা। দেশের নেতা, দশের নেতা, আমারও। সাড়ে তিনটে বাজতে চলল। আর কি আসবেন? অথচ আসাটা দরকার ছিল ওঁর আজ। এখনও এসে যেতে পারেন। ভাবতে অবাক লাগে। একদিন যাকে পথের এককোণে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন আর একদিন তারই সঙ্গে অন্য পথে অন্য প্রাঙ্গণে দেখা, আবার আর এক ধরনের সম্পর্ক। ভাগ্যিস আমি রাজনীতির পথে এসেছিলাম! তা না হলে ওঁর সঙ্গে আবার দেখা হত? আমাকে হঠাৎ প্রয়োজনে লেগে গিয়েছিল ভাগ্যিস! আর তখন আমিও আগের মতো বোকা নই। কত ধানে কত চাল এক-আধটু জেনে গেছি। তাই তো চলে এসেছে এতদিন এ ব্যবস্থা, মন্দ কি? ভালই তো, ওঁর বিরাটত্বের সামান্য ছটা পড়েছে আমারও ওপর, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কত লোকের কত হাত-কচলানো প্রার্থনা আমার কাছে এসে জমা

হয়, কত বড় বড়, মানী জ্ঞানী লোকেরা হাজির হয় এখানে, কেন? উনি মাঝে মধ্যে আসেন বলেই তো! লোকের ধারণা, হা হা-হি-হি—লোকের ধারণা উনি আর আমি—হি হি হি হি—আমরা হা হা হা হা—লোকেরা এমন বোকা; হি হি হি হি।

[মণিমুকুল হিষ্টিরিক ভাবে হাসতে থাকবে এমন সময় সূর্যপ্রতিমের প্রবেশ। খুব ধীরে ধীরে, গুরুগম্ভীর পদনিক্ষেপে, দর্শকদের যাতে মনে হয় এক হিমালয়িক উপস্থিতি মণিমুকুলের শয়নঘরে আত্ম-প্রকাশ করেছে]

সূর্যপ্রতিম। খুব আনন্দে আছ দেখছি।

মণিমুকুল। [সব হাসি একসঙ্গে গিলে ফেলে, সভয়ে] কৈ? না তো!

সূর্যপ্রতিম। আনন্দে নেই?

মণিমুকুল। আছি বই কি! নিশ্চয় আছি।

সূর্যপ্রতিম। থাকবেই তো! দেশজোড়া সবাই আনন্দে আছে। সুখে। শান্তিতে।

মণিমুকুল। নিশ্চয়।

সূর্যপ্রতিম। সবাই নিশ্চিন্তে সিনেমা যেতে পারছে রাত্রিতে।

মণিমুকুল। নিশ্চয়। আমি কাল গিয়েছিলাম।

সূর্যপ্রতিম। কার সঙ্গে?

মণিমুকুল। তুমি যার সঙ্গে যেতে বলেছিলে।

সূর্যপ্রতিম। বেশ। খবর আছে কিছু?

মণিমুকুল। লিখে রেখেছি।

সূর্যপ্রতিম। বেশ। এ সপ্তাহে কে কে এসেছিল?

মণিমুকুল। অনেকে।

সূর্যপ্রতিম। রিপোর্ট?

মণিমুকুল। লিখে রেখেছি।

সূর্যপ্রতিম। বেশ।

মণিমুকুল। খাবে?

সূর্যপ্রতিম। তুমি জান না আমি একবেলা সামান্য আহার করি। যে দেশের আর্ধেক মানুষ দু'বেলা খেতে পায় না সে দেশের নেতার একবেলা সামান্য আহারই যথেষ্ট।

মণিমুকুল। নিশ্চয়। ডাক্তারবাবুর কড়া মানা আছে তোমার এক-বেলার বেশি খাবার।

সূর্যপ্রতিম। জীবনে কারুর মানা শুনি নি, তুমি জান না?

মণিমুকুল। নিশ্চয়। কৃপানন্দ মহারাজের ছাড়া। তিনি মানা করলে কিন্তু তুমি বেশ মানো।

সূর্যপ্রতিম। ভগবানের মানা না মেনে উপায় নেই। রাজশক্তি আর ধর্ম সহোদর।

মণিমুকুল। নিশ্চয়। তুমি একটু বিশ্রাম করবে?

সূর্যপ্রতিম। দেশের একটা লোক বেকার থাকা পর্যন্ত আমার বিশ্রাম নেই।

মণিমুকুল। নিশ্চয়। তেষ্টা পেয়েছে? কিছু নিয়ে আসব?

সূর্যপ্রতিম। কোটি কোটি লোক তৃষ্ণার্ত। আমি কি ক'রে নিজের তৃষ্ণা মেটাই।

মণিমুকুল। নিশ্চয়। [কি করবে, কি বলবে বুঝতে না পেরে] তুমি কি একটু বক্তৃতা করবে?

সূর্যপ্রতিম। তিনবার হয়ে গেছে। আরও দুটো আছে সন্ধ্যার দিকে।

মণিমুকুল। নিশ্চয়। তবে তুমি কি করবে?

সূর্যপ্রতিম। তোমার সঙ্গে কথা আছে। বোসো।

মণিমুকুল। নিশ্চয়। [দাঁড়িয়ে রইল]

সূর্যপ্রতিম! [সামান্য দৃঢ়তার সঙ্গে] বোসো।

মণিমুকুল। নিশ্চয়। [দূরে বসল]

সূর্যপ্রতিম। কাছাকাছি এসে বোসো। এখানে।
মণিমুকুল। নিশ্চয়। [সরল না]
সূর্যপ্রতিম। [দৃঢ়তা] এখানে।
মণিমুকুল। নিশ্চয়। [সূর্যপ্রতিমের পাশে বসল। সূর্যপ্রতিম মণিমুকুলের পিঠে হাত রাখল। হাত উঠে এল মণিমুকুলের কাঁধে, স্পর্শ করল গলা, গাল]
মণিমুকুল। নিশ্চয়।
সূর্যপ্রতিম। তুমি বেশ সুখে আছ।
মণিমুকুল। নিশ্চয়।
সূর্যপ্রতিম। কোনও অসুবিধে নেই।
মণিমুকুল। নিশ্চয়।
সূর্যপ্রতিম। তোমার ভূমিকা এবার বদলাবে।
মণিমুকুল। নিশ্চয়।
সূর্যপ্রতিম। তোমাকে ক্ষমতার প্রথম বৃত্তের মধ্যে স্থাপন করব। এখন তুমি আছ তৃতীয় বৃত্তে।
মনিমুকুল। নিশ্চয়।
সূর্যপ্রতিম। তুমি এবার মন্ত্রী হবে।
মণিমুকুল। নিশ্চয়। [হঠাৎ চেঁচিয়ে] কি বললে ?
সূর্যপ্রতিম। তুমি এবার মন্ত্রী হবে।
মণিমুকুল। [ভয় পেয়ে] কেন ?
সূর্যপ্রতিম। আমার ইচ্ছে।
মণিমুকুল। নিশ্চয়।
সূর্যপ্রতিম। তোমার মন্ত্রী হতে ইচ্ছে নেই ?
মণিমুকুল। [ঘাড় নেড়ে জানাল, আছে।]
সূর্যপ্রতিম। মন্ত্রী না হলে এবার তোমাকে যে কাজ দেব তা করা সম্ভব নয়।

মণিমুকুল। নিশ্চয়। দেশের উন্নতি।
সূর্যপ্রতিম। মন্ত্রী হয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।
মণিমুকুল। [ভয়] না, না।
সূর্যপ্রতিম। কি করতে হবে সব শিখিয়ে দেব। ভয়ের কিচ্ছু নেই।
মণিমুকুল। নিশ্চয়।
সূর্যপ্রতিম। তুমি আমারই থাকবে।
মণিমুকুল। নিশ্চয়।
সূর্যপ্রতিম। কিন্তু আমার প্রতিপক্ষের অভিনয় করবে।
মণিমুকুল। নিশ্চয়।
সূর্যপ্রতিম। তাহলে কারা আমার আসল প্রতিপক্ষ তুমি জানতে পারবে।
মণিমুকুল। নিশ্চয়।
সূর্যপ্রতিম। রিপোর্ট লিখবে।
মণিমুকুল। নিশ্চয়।
সূর্যপ্রতিম। আমি তাদের বধ করব।
মণিমুকুল। নিশ্চয়।
সূর্যপ্রতিম। পারবে তো ?
মণিমুকুল। [ঘাড় নেড়ে জানাল, পারবে।]
সূর্যপ্রতিম। তোমাকে একদিন দুঃখ দিয়েছিলাম।
মণিমুকুল। [সরে বসল।]
সূর্যপ্রতিম। অবশ্য তোমাকে স্বামী পাইয়ে দিয়েছিলাম। অনাদি তোমায় বিয়ে করেছিল।
মণিমুকুল। [আরও সরে বসল।]
সূর্যপ্রতিম। তোমার সন্তানও ঠিকমতো জন্মেছিল।
মণিমুকুল। [আরও সরে গেল।]
সূর্যপ্রতিম। সে বাঁচে নি তাতে আমার কোনও দোষ ছিল না।

মণিমুকুল। [পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।]

সূর্যপ্রতিম। অনাদিকে তুমিই ছেড়ে চলে গিয়েছিলে।

মণিমুকুল। [পাথর।]

সূর্যপ্রতিম। ভালই করেছিলে। স্বামী সংসার রাজনীতি দেশসেবা একসঙ্গে চলে না। দেশসেবার পথে এসেছিলে বলেই আবার আমাদের সাক্ষাৎ হল।

মণিমুকুল। [পাথর।]

সূর্যপ্রতিম। সেই থেকে তো ভালই আছ। কি বল? [দৃঢ়তার সঙ্গে] কি বল?

মণিমুকুল। নিশ্চয়।

সূর্যপ্রতিম। তুমি আমার অনেক কাজ করেছ। আমার কাজ মানে দেশের কাজ।

মণিমুকুল। নিশ্চয়।

সূর্যপ্রতিম। এবার তোমার পুরস্কার পাবার সময় এসেছে।

মণিমুকুল। নিশ্চয়।

সূর্যপ্রতিম। আমি তোমাকে মন্ত্রী করে দেব।

মণিমুকুল। নিশ্চয়।

সূর্যপ্রতিম। এখানে এসো। [দৃঢ়তার সঙ্গে] এস। এখানে বসো। আমার পাশে। [দৃঢ়তার সঙ্গে] এখানে।

[মণিমুকুল বসলে সূর্যপ্রতিম তার কাঁধে ঘাড় রাখলেন। হাতের আঙুল তার গাল স্পর্শ করল। গাল, গলা, কাঁধ স্পর্শ ক'রে স্তনের দিকে নেমে এল হাত।]

মণিমুকুল। নিশ্চয়।

[মঞ্চে অন্ধকার নামল ধীরে ধীরে। অন্ধকারে শোনা গেল, মণিমুকুল বলছে, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।" মঞ্চ মিনিটখানেক অন্ধকার রইল। যখন আলো জ্বলল, দেখা গেল নাটকের পাঁচটি চরিত্র যে যার

স্বস্থানে স্থিত। সূর্যপ্রতিম মঞ্চের মধ্যভাগে টেবিলের সামনে উপবিষ্ট। মণিমুকুল তার শোবার ঘরে বিছানায় পা তুলে বুকের ওপর শুয়ে একটা ম্যাগাজিন দেখছে। পার্কের বেঞ্চিতে বসে আছে শৌনিক, সামনে দাঁড়িয়ে অনুভূতি। অবিনাশ ধর পার্কের এক কোণে দর্শকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এরা যা বলবে তা আত্মালাপ, পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন নয়, এদের উচ্চারিত বাক্য, শব্দ এবং নীরবতা ক্রমশ উচ্চতা এবং উগ্রতা প্রাপ্ত হবে, যাতে সব দৃশ্যাঙ্কটি মনে হয় একটি ধারাবাহিক ঊর্ধ্বারোহী আবেগ, যদিও তাতে উচ্ছ্বাস থাকবে লঘুপর্দার, বাক্য ও শব্দ নীরবতার সঙ্গে মিশে মুখরতর হবে।]

সূর্যপ্রতিম। অতএব, বন্ধুগণ, যারা পরিবর্তনের লাল নেশায় আপনাদের মাতিয়ে তুলতে চাইছে, তাদের চিনে রাখুন। তারা আপনাদের মিত্র নয়, সুহৃদ নয়। তারা জানে না আপনারা পরিবর্তনের চেয়ে স্থিতিশীলতাকে অনেক বেশি মূল্যবান মনে করেন। রাত্রি ন'টায় নির্বিঘ্নে ছায়াচিত্র উপভোগ করার অধিকার আপনাদের কাছে অনেক বেশি দামী নতুন সমাজের মিথ্যা মরিচিকার চেয়ে। আপনাদের প্রধানতম কাম্য শান্ত। স্থিতি। মাসকাবারে মাইনে। বছরের শেষে নতুন শিশু। পুত্রের বিবাহে যৌতুক। রবিবারে নিশ্চিন্ত দিবানিদ্রা। ইনস্টলমেণ্টে শাড়ি কেনা। তিন বছর পরে পরে একখানা গহনা। এই তো সত্যিকারের জীবন, বিধাতার আশীর্বাদ নিয়ে যার আরম্ভ, বিধাতার আশীর্বাদ নিয়ে যার শেষ। আমি আশ্বাস দিচ্ছি আপনাদের এই প্রাচীন ছন্দে পরিচিত জীবনধারা অব্যাহত থাকবে। কোনও শক্তি, তা সে অন্ত্যজ হোক কিংবা বহিরাগত, তাতে ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না।

অবিনাশ ধর। সোজা অঙ্ক, সোজা হিসেব। একে একে দুই, উঠি

বসি শুই। দুয়ে দুয়ে চার, মাসের শেষে ধার। চারে চারে আট, ইয়েস নো বাট। আটে আটে ষোল, গল্প শেষ হল।

মণিমুকুল। [ম্যাগাজিন পড়তে পড়তে] বেশ লিখেছ এইখানটা তুমি, লক্ষ্মী ছেলে, সোনার ছেলে। "কিশোর বয়সে যখন আমাদের মেয়েরা মাত্র নতুন নতুন রঙিন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, মণিমুকুলের কোমল মানসে জেগে উঠল এক দৃপ্ত বলিষ্ঠ স্বপ্ন : দেশমাতাকে স্বাধীন করার স্বপ্ন। জীবনের বহু প্রলোভন, বহু আকাঙ্ক্ষা তুচ্ছ ক'রে মণিমুকুল যাঁর পদতলে বসে নতুন জীবনের অগ্নিদীক্ষা নিল, তিনি আজ এ দেশের অদ্বিতীয় নেতা, তাঁর নেতৃত্ব অনুসরণ ক'রে মণিমুকুল আজ দেশনায়িকাদের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে। সৌন্দর্য, সুশিক্ষা, সুরুচি, শালীনতা; বহুগুণে আলোকিত মণিমুকুল ইচ্ছে করলে জীবনে তথাকথিত সার্থকতার শীর্ষে উঠতে পারতেন। পরিবর্তে, ভারতবর্ষের সনাতন গৈরিক পথ অনুসরণ ক'রে ত্যাগ ও সেবার ব্রত যাপন ক'রে তিনি আজ অন্যতর আলোকে উপনীত। এ আলোক যে তাঁর সংস্পর্শে আসে তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে থাকে। "লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে, সোনাসোনা লিখেছ। এবার যখন সংস্পর্শে আসবে, অনেক আলো তোমাকে দেব, বুঝেছ? আলোয় তোমার চোখ ঝলসে যাবে, বুঝেছ?

শৌনিক। দেয়াল, দেয়াল, দেয়াল। যেদিকে এগোতে চাও, সামনে দেয়াল। উঁচু, পোক্ত দেওয়াল, টপকাবার উপায় নেই, ভাঙা অসম্ভব। মোড়ে মোড়ে কড়া পাহারা। জীবনটাকে গুটিয়ে নিয়ে কোনও মতে বেঁচে থাকা। বস্তিই বলুন, ভদ্রপাড়াই বলুন, অবস্থা একই। বস্তি আমাদের মনে, পচা নর্দমা, এক বালতি জলের জন্যে কাড়াকাড়ি-মারামারি, বস্তি আমাদের মনে। ও

জানে না, ঐ পাগলী মেয়েটা, বোঝে না কিছুই, কেবল ছুটে চলে, কেবল চেঁচায়, বন্যা, বন্যা বন্যা।

অনুভূতি। বন্যা, বন্যা, বন্যা। তুমি ছাড়া মুক্তি নেই আমার, আমাদের। বহু শতাব্দীর জঞ্জাল জমে পাহাড়, ঠুকঠাক টুকটাক তুকতাক ক'রে এ জঞ্জাল যাবে না, যাবে না। বন্যা, বন্যা, বন্যা, একমাত্র মুক্তির পথ বন্যা। অনেক কিছু ভেসে যাবে, ধ্বংস হবে, সঙ্গে সঙ্গে নতুন মাটিতে নতুন জীবন নেবে জন্ম; উর্বর হবে পুনরায় এই প্রাচীন মাটি। বন্যা বন্যা বন্যা।

অবিনাশ ধর। ভুল আমারও হতে পারে, হয়তো ছেলেটার সত্যি দোষ ছিল না। হয়তো ও ঠিকই করেছিল। হয়তো আমি কঠিন বিচার ক'রে ওকে বুঝতে পারি নি। ছেলেটা অন্তত অন্যায় সহ্য করে নি, মেনে নেয় নি। যে ওর সরল সতেজ মন আর আকাশ-আকাশ চোখকে ঠকিয়েছিল, তারই সামান্য দাক্ষিণ্য নিয়ে নাদুসনুদুস পরিপুষ্ট হতে রাজী হয় নি। লড়েছে। মেনে নেয় নি। মাথা নত করে নি। হেরে গেছে? মরে গেছে? মরত তো একদিন বটেই! সত্যি কি হেরে গেছে? কি বলেন আপনারা? আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। হিসেব আর অমন সহজ মনে হচ্চে না। হেরে গেছে কি ছেলেটা?

সূর্যপ্রতিম। সবচেয়ে বড় কথা হল মনকে শান্ত রাখা। অশান্ত মন অশান্তি আনে। ঘরে, গ্রামে, শহরে, দেশে, দুনিয়ায়। মন শান্ত রাখার উপায় অতি সহজ। প্রতিদিন বোধোদয় পাঠ। দেবদ্বিজে ভক্তি। সমাজের প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী মেনে চলা। নেতৃত্বের বিজ্ঞতায় অটল বিশ্বাস। এ জন্য প্রয়োজন প্রতিদিন পাঁচবার আকাশবাণীর সমাচার শ্রবণ। ব্রতকথা শ্রবণের মতো ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহ। তাহা হইলে নেতৃত্বে বিশ্বাস ও নির্ভরতা সহজ এবং স্থায়ী হইবেক।

মণমুকুল। এক দেশে এক রাজা ছিল। একদিন সে রাজ্য দেখতে বার হল। গায়ে একটুকরো জামাকাপড় নেই—ছি ছি কি লজ্জা, একেবারে উদোম। অথচ যেখানে যায় সবই অবাক হয়ে মুগ্ধ হয়ে বলে, আহা, রাজার কি সুন্দর বেশ! কি চমৎকার পোশাক! গল্পটা আপনারা অনেকেই জানেন। আচ্ছা বলুন তো, ভুল কার? প্রজাদের চোখের? উলঙ্গ রাজার উদোম দেহকে তারা চোখ-চমকানো পোশাকে সজ্জিত দেখল কি ক'রে? দৃষ্টিভ্রম? মনের ভ্রম? ভুল হল, পারলেন না! আসল ব্যাপারটা আপনাদের জানা নেই। রাজা ভ্রমণে বার হবার আগে তাঁর প্রচার বিভাগ তৎপর হয়েছিল। রটিয়ে দিয়েছিল, রাজা অমূল্য, অতুলনীয় বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে রাজ্য দেখতে বেরুবেন? দেহে থাকবে সবচেয়ে দামী রেশমী পোশাক সোনার কাজ করা। মাথায় মণিমুক্তাখচিত রাজমুকুট, শরীরে হিরেপান্নামণিমুক্তার আভরণ। রাজা যখন উদোম হয়ে ভ্রমণে বেরুলেন, প্রজাদের মাথায় ও মনে তাঁর বেশভূষণের ছবি আঁকা হয়ে গেছে, রাজাকে দেখে তারা দেখল সেই ছবি, রাজার দেহের উলঙ্গতা তাদের চোখে ধরা পড়ল না। প্রচারের এমনই মহিমা। যা আপনারা অনেকবার শুনবেন, পড়বেন, দেখবেন, তার ছবি আঁকা হয়ে গেছে আপনাদের মনে, তখন তাই হবে 'বাস্তব', রিয়ালিটি, বুঝলেন? এই হল নিয়ম। যদি বাস্তবকে চিনতে না পারেন, দোষ আপনাদের। দেশে সমাজতন্ত্র স্থাপিত হয়ে গেছে, গরীবি হটছে, এই বাস্তবকে যদি চিনতে না পারেন, আপনাদের চোখের চিকিৎসা চাই, চশমার প্রয়োজন। তাই, জানেন, আমি যখন মন্ত্রী হবো, হবো নিশ্চয়, কি বলেন? ওঁর কথা তো আপনারাও শুনেছেন, ওঁকে দেখলেনও এতক্ষণ ধরে, এমনিভাবে আপনাদের চোখের সামনে কথা দিয়ে নিশ্চয় ল্যাং মারবেন না, কি বলেন? আমি মন্ত্রী হলে কোন

দপ্তরের ভার চাইবো জানেন? দৃষ্টি-নিয়ন্ত্রণ দপ্তর। জন্ম-নিয়ন্ত্রণে কিস্যু হবে না! ঐ এক-দুই-তিন-ব্যস করতে করতেই জনসংখ্যা আর দশ বছরে সত্তর কোটি হয়ে দাঁড়াবে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বদলে চাই দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ। আপনাদের চোখের দৃষ্টি বদলে দিতে হবে। যেদিক পানে নয়ন মেলবেন, দেখতে পাবেন : ভালো, ভালো, ভালো। দশ পয়সা দামে বিক্রি হবে 'আচশমা'—'আশা' আর 'চশমার প্লাষ্টিক সন্ধি। যাদের মাইনে তিনশ' টাকার কম, তাদের ফ্রি দেওয়া হবে। 'আচশমা' পরে মানুষ দেখবে কেবল কদম ফুল। যা দেখবে তাই মনে হবে, বাঃ, বেশ তো! ধরুন এই কলকাতা শহরেই। 'আচশমা' পরলে রাস্তায় ময়লা দেখতে পাবেন না, দেখবেন শ্বেতপদ্ম আর রজনীগন্ধা। ফাটল আর গর্ত দেখবেন না, দেখবেন রঙিন ফোয়ারা। পথে একটিও শুকনো-মুখ পেটেভাতপড়েনি লোক দেখতে পাবেন না। প্রত্যেককে দেখাবে লালা রামজিনারায়ণ চৌবের বঙ্গ-সংস্করণ! গ্র্যাণ্ড আইডিয়াটা, না? যে সব কলকারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেগুলোকে জাতীয়করণের আওতায় এনে কেবল 'আচশমা' তৈরি করা হবে। লুপ আর নিরোধ দিয়ে কি হবে? লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি 'আচশমা' তৈরি হলে একজনও আর বেকার থাকবে না, কি বলেন? আপনাদের সমর্থনটা আছে তো? আছে, না? ধন্যবাদ। তাহলে কালই একটা মিছিল বার করুন। 'দৃষ্টি-নিয়ন্ত্রণ' জিন্দাবাদ আমাদের দাবী : 'আচশমা'।

শৌনিক। সে এক দারুণ মজার ব্যাপার। বস্তিতে ডাক্তারী করতে গিয়ে দেখলাম সবাই মনে মনে ভদ্রলোক হবার জন্যে পাঁয়তাড়া দিচ্ছে। বেশ্যারা পর্যন্ত! খেতে না পাক, ব্রা-ব্লাউজ-পাউডার-স্নো-সাবানটুকু চাইই। ছোকরারা সরু প্যাণ্ট পরছে, চুল ছাঁটছে ভদ্রপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়ে। মিলের কাজ সেরে দিশী মদ

খেয়ে ঘরে ফেরার সময় পুরুষের হাতে দেখেছি রজনীগন্ধা। 'কি ভেবেছেন মশাই, আমরা কি ভদ্দরলোক নই!' নিশ্চয়, একশ'বার, তোমরা সবাই ভদ্দরলোক! আর তাই যদি হল, কি দরকার আমার বস্তির ডাক্তার হয়ে? ভদ্দরলোকদের ডাক্তার হলে তবু পাঁচ টাকা ফী। কিন্তু কি জানেন, ভদ্রপাড়ায় এসে দেখলাম, সব বস্তি, বস্তি, বস্তি। মনের মধ্যে বস্তি। দুর্গন্ধ পচা নর্দমা। লোভ, লোভ আর লোভ। সেই এক কাড়াকাড়ি, জল নিয়ে, ফল নিয়ে, ফুল নিয়ে।

অবিনাশ ধর। ছেলেটা যদি বেঁচে থাকত, হয় বস্তিতে বাস ক'রে ভদ্দরলোক হত, যেমন আমি। নয় ভদ্রপাড়ায় বাস ক'রে বস্তি-মন হত, যেমন, যেমন, যেমন (দর্শকদের নাম করতে গিয়ে, শুধরে নিয়ে) কেউ নয়!!

অনুভূতি। বন্যা, বন্যা, বন্যা, আসচে, আসবে, আসবে।

শৌনিক। নদনদী সমুদ্র সব পলাতক।

মণিমুকুল। বিপ্লব চাই—শাদা, সবুজ, নীল, হলদে, নীরব বিপ্লব, শান্ত সুবোধ সুশীল বিপ্লব।

অবিনাশ। যার যা আছে তা থাকবে, যার যা নেই, থাকবে না। যে যেখানে আছ, সুখে থাকো। সুখে থাকতে থাকতে, মরে যাও, কেমন? লক্ষ্মী ছেলেরা সব! খাসা ছেলেরা সব! নামতা পড়ো। একে একে দুই উঠি বসি শুই। দুয়ে দুয়ে চার, চাই নে কিছু আর। তিনে তিনে ছয়, প্রভু দিন আশ্রয়।

অনুভূতি। আমি তোমার অপেক্ষায় বেঁচে থাকব, আমি জানি বন্যা, তুমি আসবে। কোথা থেকে, কোন পথে, কোন তীর ছাপিয়ে, কোন জনপদ ভাসিয়ে, আজও জানি নে, শুধু জানি তুমি আসবে, আসবে। অনেক জঞ্জাল জমেছে, অনেক শতাব্দীর, বহু যুগের। কত জীবন কুঁকড়ে চিপসে মরে আছে, কত আশার দীর্ঘনিশ্বাসে

বাতাস তপ্ত, কত গ্লানি, অসম্মান, কত অবমাননা। কত জুলুম কত প্রভুত্ব, কত অবিচার। আর কত মানুষ! এক একটি মানুষ এক একটি স্ফুলিঙ্গ। বন্দরে, নগরে, গ্রামে মাঠে কারখানায়, রাস্তায়—কাজ করে কত মানুষ! কত তাদের স্বপ্ন, আশা, ফুটে উঠবার, ফেটে পড়বার অক্লান্ত প্রচেষ্টা। মানুষ আনবে, নিয়ে আসবে তোমাকে, বন্যা, একদিন, জনপথে, রাজপথে, গ্রামে নগরে, তুমি আসবে, ধ্বংসের দুন্দুভি বাজিয়ে, নতুনের আহ্বান নিয়ে আমি আমরা, আমরা অনেকে, অনেকে, বহুদেশে সব মহাদেশে, তোমার প্রতীক্ষায়। আমি, আমার পিতৃহীন সন্তান, এই পিতৃহীন সমাজ সভ্যতা, আমরা তোমার প্রতীক্ষায়।

মণিমুকুল। দৃষ্টি-নিয়ন্ত্রণ উদ্যোগে সফল হলে তখন আরও কত কি করা যাবে, তাই না! ভেবে কিন্তু আমার ভীষণ অস্থির লাগছে। উত্তেজনা হচ্ছে! গরম লাগছে! (গা থেকে আঁচল সরিয়ে, আঁচল দিয়ে হাওয়া করতে করতে) এক একটা আইডিয়ার কী তেজ? বাবাঃ! যেন জ্বলন্ত চুলা, না? আমি আর সামলে উঠতে পারছি না! দৃষ্টি-নিয়ন্ত্রণ সফল হলে চিন্তা-নিয়ন্ত্রণ। আপনাদের আর কোনও চিন্তাই করতে হবে না, সব চিন্তা, ভাবনা, ধ্যানধারণার ভার আমরা নিয়ে নেব! আপনারা কেবল খাবেন—অথবা উপবাস করবেন—ঘুমুবেন, অথবা অনিদ্র থাকবেন—প্রেম করবেন, অথবা করবেন না। যেমন আপনাদের অভিরুচি, আর, আর, আর কি করবেন—হ্যাঁ মরে গিয়ে স্বর্গলাভ করবেন—স্বর্গে অথবা নরকে পপুলেশন প্রবলেম নেই। তাহলে? তাহলে ভেবে দেখুন তো! দৃষ্টি-নিয়ন্ত্রণ আইডিয়াটা কী দারুণ ব্যাপার। ওঁকে না বলে আর পারছি না। এত বড় এমন জ্বলন্ত-

চুলো। একটা আইডিয়া আমার মাথায় এসেছে জানতে পারলে উনি আজই আমাকে মন্ত্রী ক'রে দেবেন! কি মনে হচ্ছে আপনাদের? উনি তো সব সময় বলেন, নতুন আইডিয়া চাই, নতুন মানুষ চাই, অথচ মন্ত্রী বাছবার বেলা সব কেবল তাঁদেরই বেছে নেন যাদের মাথা এক একটি চালকুমড়ো! বলি ওকে? বলব? টেলিফোন করব? যদি রাগ করেন? কেমন ভয় ভয় করে, জানেন। টেলিফোন করি। (টেলিফোন তুলে ডায়াল করতে গেল, তক্ষুনি সূর্যপ্রতিমের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠে টেলিফোন রেখে দিল।)

সূর্যপ্রতিম। বন্ধুগণ, আপনাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। আপনারা নাগরিকতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছেন। আপনাদের মধ্যে বালকসুলভ চপলতা বিনষ্ট হয়েছে। আপনারা সকলে বৃদ্ধ হয়েছেন। বয়স যাই হোক না কেন, ষোলো কিংবা উনষাট, আপনাদের প্রত্যেকের নয়নাভিরাম বার্ধক্যপ্রাপ্তি ঘটেছে। অতি আনন্দের কথা। আমি এই স্বাগত ঘটনাকে আমার নেতৃত্বের চরম পুরস্কার মনে করি। আপনাদের মানসে আর কোন কিছুই আলোড়ন আনে না। কিছুতেই আপনারা উচ্ছ্বসিত হন না। আপনাদের মস্তিষ্ক এমন উর্বরতা প্রাপ্ত হয়েছে যে আইডিয়া নামক কাঁটাগাছ আর ওতে জন্মায় না। আমি প্রতিদিন আপনাদের লেখনী-নিঃসৃত বাক্যসমূহ মনোযোগের সহিত পাঠ করি। তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে থাকি যে একই কথা একই ভাষায় পঁচিশ বছর ধরে আপনারা লিখে আসছেন, তথাপি আপনাদের লেখনী অক্লান্ত, বস্তুতপক্ষে যত আপনাদের বার্ধক্য বাড়ছে, আইডিয়া নামক ব্যাধি হতে যত আপনারা রেহাই পাচ্ছেন, আপনাদের লেখনী কর্মঠ এবং তৎপর হচ্চে। এ অতি উত্তম পরিস্থিতি। আপনারা দ্রুত প্রাচীন শাশ্বত জড়ত্বে উপনীত

হচ্চেন। অতএব সিদ্ধার্থ অবস্থায় উপনীত হয়ে আপনারা আর পরিবর্তন চান না, চান স্থিতি। অতএব আপনারা আলোড়ন চান না, চান স্বস্তি। অতএব আপনারা বুঝতে পেরেছেন, উন্নতির চেয়ে ফাইভ ইয়ার প্ল্যান অনেক বড়, কাজের চেয়ে কথা অনেক বড়, যত দিন বাণী আছে, আকাশবাণী, ততদিন ভবিষ্যৎ উর্বর, বর্তমান হোক না তপ্ত মরু। আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, যতদিন আমি আছি এবং আপনারা যতদিন আপনাদের ব্যক্তিগত ও যৌথ বার্ধক্য অস্তি, ততদিন এই প্রাচীন মাতৃভূমি নিরাপদ। ততদিন যা যেমন আছে তেমনি থাকবে, মাঝে মধ্যে একটু আধটু এদিক-ওদিক অবস্থার হেরফের হতে পারে, কিন্তু তরণী আবার ঠিক সময় ঠিক হাতে চলে আসবে, সমাজ হবে সুস্থির নিশ্চল শান্ত, নিশ্চিন্ত নিস্পন্দ। আপনারা রাত ন'টায় স্ত্রী এবং শাশুড়ীকে নিয়ে বাংলা সিনেমা নামক বার্ধক্যের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। আমি আশ্বাস দিচ্ছি বর্ধমানে কেউ বাড়বে না, হুগলির জল ত্রিবর্ণ থাকবে। আপনারা ঠিক পথে চলেছেন। এই পথই যুধিষ্ঠির নির্দেশিত মহাপ্রস্থানের পথ। এ পথে গেলে বছরের শেষে মাইনে বাড়ে, উনচল্লিশে চুল পাকে, দাঁত নড়ে, বিয়াল্লিশে বাত হয়, পঞ্চাশে পৌছলে কেবল ঘুম পায়, গুরুপ্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এই ঠিক পথ, এ পথ নিরাপদ, বহু শতাব্দীর পরীক্ষিত ঐতিহাসিক নির্বাণের পথ। এ পথে চলতে চলতে আপনারা অবিরাম সন্তান এবং গল্পউপন্যাসকবিতা উৎপাদন করুন, তাতেই দেশ পুনরায় ধনধান্যে ভরে উঠবে।

বন্ধুগণ, আমি জানি, আমি জানি, এই সনাতন সুসভ্য বার্ধক্যের পথে পৌঁছনো সহজ নয়। অনেক কষ্ট দুঃখ বেদনা অতিক্রম ক'রে এ পথের সন্ধান আপনারা পেয়েছেন। জীবন নামক দুর্দান্ত শয়তান বার বার আপনাদের প্রলোভন দেখিয়েছে, নতুনের প্রলোভন,

পরিবর্তনের প্রলোভন। দু' একবার আপনাদের চিত্ত চঞ্চল হয়েছে, জীবনের প্রলোভনে আপনারা সাড়া না দিয়ে পারেন নি। কিন্তু এই প্রাচীন বার্ধক্যের এমন মহিমা যে অচিরে আপনারা আপনাদের ভুল বুঝতে পেরেছেন, এবং জীবন নামক শয়তানকে শায়েস্তা ক'রে পুনরায় বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। দু'ঘণ্টা আপনাদের দেখতে পেয়ে আমি পরম নিশ্চিন্ত হয়েছি। যে অসীম ধৈর্য ও অসাধারণ সহনশীলতার সঙ্গে আপনারা আমার সামনে দু'ঘণ্টা বসে রইলেন তাতে আমার প্রত্যয় দৃঢ় হয়েছে যে আপনাদের, আপনাদের, কোনও ভয় নেই। আপনারা সুপ্রাচীন বৃদ্ধ, আপনাদের হাতে এই সুপ্রাচীন সভ্যতা সম্পূর্ণ সংরক্ষিত। আমার, অতএব, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, আপনারা যে যা আছেন তাই থাকবেন যে যা নেই তা হবেন না, এবং আপনাদের পঞ্চবার্ষিকী বিজ্ঞতার বৃদ্ধ ব্যবহারে আমিও যা আছি তাই থাকব, আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে, আমরা জোর কদমে এগিয়ে চলে যা আছি তাই থাকব।

বন্ধুগণ, এখন আপনারা আসতে পারেন। ভয়ের, শঙ্কার কোনও কারণ নেই। দরজা খুলে দিয়েছে দ্বারীগণ, আস্তে আস্তে রয়ে সয়ে যাবেন, যাতে অপেনাদের বার্ধক্যপুষ্ট দেহে হঠাৎ রক্তের গতি বৃদ্ধি না পায়। দেখবেন, রাজপথ শান্ত নিরাপদ। চোর ডাকাত বদমাশের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু এরাও বৃদ্ধ অতএব মহানগরী নিঃশঙ্ক। আপনারা আসুন, গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন, এবং পরম সুখে নিদ্রিত হোন। নিদ্রার পূর্বে বিধাতার কানে প্রতি রজনীতে পৌঁছুক কোটি কোটি নির্বাপিত মানুষের সমবেত প্রার্থনা : সেই বার্ধক্য চাই, সেই প্রাচীন, প্রাজ্ঞ, সুস্থির, নিশ্চল, নিস্তব্ধ, স্তিমিত বার্ধক্য, প্রভু, সেই বার্ধক্য চাই, সেই বার্ধক্য।

[এক সঙ্গে সব আলো নিভবে, নাটক শেষ হবে]
